রক্তের বিষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৪৮

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : গৌতম রায়

মুদ্রণ : স্টাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও আরিন প্রিন্টার্স ৫১।১।১, সিকদার বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪ হইতে

'রা-স্বা'

শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমতী উমা ভট্টাচার্য

করকমলেষু

উপন্যাস

যাও পাখি

ঘুণপোকা

পারাপার

উজান

ফেরা

বৃষ্টির ঘ্রাণ

শূন্যের উদ্যান

ফেরিঘাট

বাস স্টপে কেউ নেই

নয়নশ্যামা

সুখের আড়াল

দিন যায়

আশ্চর্য ভ্রমণ

কাগজের বউ!

শ্যাওলা

রঙীন সাঁকো

ভুল সত্য

গল্পগ্রন্থ

নির্বাচিত গল্প

একালের বাংলা গল্প

ঘরের পথ

পাপ

গল্প-সংগ্রহ

কুকুরগুলো বাইরে খ্যাঁকাচ্ছে। সে এমন চ্যাংড়ামি যে মাথা—
গরম হয়ে যায়।

গগনচাঁদ উঠে একবার গ্যারাজঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। লাইটপোস্টের তলায় একটা ভিখিরি মেয়ে তার ছুটো বাচ্চাকে নিয়ে খেতে বসেছে। কাপড়ের আঁচল ফুটপাথে পেতে তার ওপর উচ্ছিষ্ট খাবার জড়ো করেছে। কুকুরগুলো চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে লাগাতার।

গগনচাঁদ একটা ইট কুড়িয়ে নিয়ে নির্ভুল নিশানায় ছুঁড়ে কুকুরটার পাছায় লাগিয়ে দিল। কুকুরটার বীরত্ব ফুস করে উড়ে যায়, কেউ কেউ করতে করতে নেংচে সেটা পালায়। সঙ্গে আরগুলো। গগনচাঁদ ফের তার গ্যারাজঘরে এসে বসে। রাত অনেক হল। গগনচাঁদের ভাত ফুটছে, তরকারির মশলা এখনো পেশা হয়নি।

মশলা পিষবার শিল-নোড়া গগনের নেই। আছে একটা হামানদিস্তা। তাইতেই সে হলুদ গুঁড়ো করে, ধনে-জিরে ছাতু করে ফেলে। একটা অসুবিধে এই যে, হামানদিস্তায় একটা বিকট টং টং শব্দ ওঠে। আশপাশের লোক বিরক্ত হয়। আর এই বিরক্তির ব্যাপারটা গগন খুব পছন্দ করে।

এখন রাত দশটা বাজে। গ্রীষ্মকাল। চারপাশেই লোকজন জেগে আছে। রেডিও বাজছে, টুকরো-টাকরা কথা শোনা যাচ্ছে, কে এক কলি গান গাইল, বাসন-কোসনের শব্দও হয়। গগন হামানদিস্তা নিয়ে হলুদ গুঁড়ো করতে বসে। আলু ঝিঙে আর পটল কাটা আছে, ঝোলটা হলেই হয়ে যায়।

গ্যারাজটায় গাড়ি থাকে না, গগন থাকে। গ্যারাজের ওপরে নীচু ছাদের একখানা ঘর আছে, সেটাতে বাড়িওলা নরেশ মজুমদারের অফিসঘর। কয়েকখানা দোকান আছে তার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে। নিজের ছেলেপুলে নেই, শালীদের দু-তিনটে বাচ্চাকে এনে পালে পোষে। তার বৌ শোভারাণী ভারী দজ্জাল মেয়েছেলে। শোভা মাঝে মাঝে ওপরের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে—শিল-নোড়া না থাকে তো—বাজারের গুঁড়ো মশলা প্যাকেটে ভরে বিক্রি হয়, নাকি সেটা কারো চোখে পড়ে না? হাড়-হারামজাদা পাড়া-জ্বালানী গু-খেগোর ব্যাটারা সব জোটে এসে আমার কপালে!

সরাসরি কথা বন্ধ। বাড়িতে একটা মাত্র কল, বেলা ন'টা পর্যন্ত তাতে জল থাকে। জলের ভাগীদার অনেক। গ্যারাজে গগন। রাতে নরেশের কিছু কর্মচারী শোয় ওপরতলার মেজেনাইন ফ্লোরে। সব মিলিয়ে পাঁচজন। ভিতর-বাড়ির আরো চার ঘর ভাড়াটের ষোলো-সতেরোজন মিলে মেলাই লোক। একটা টিপকল আছে, কিন্তু সেটা এত বেশি ঝকাং ঝকাং হয় যে বছরে ন'মাস বিকল হয়ে থাকে। জল উঠলেও বালি মেশানো ময়লা জল উঠে আসে। তাই জলের হিসেব ঐ একটা মাত্র কলে। অন্য ভাড়াটেদের অবশ্য ঘরে ঘরে কল আছে, কিন্তু মাথা উঁচু কল বলে তাতে ডিমসুতোর মত জল পড়ে। উঠোনের কলে তাই হুড়োহুড়ি লেগেই থাকে। একমাত্র নরেশের ঘরেই অঢেল জল। নিজের পাম্পে সে জল তুলে নেয়। কিন্তু সে জল কেউ পায় না, এমন কি তার কর্মচারীরাও নয়। গগনচাঁদ কিছু গম্ভীর মানুষ, উপরন্তু কলেজ আর তিনটে ক্লাবের ব্যায়াম-শিক্ষক, তার বালতি কিছু বড় এবং ভারী। কাউকে সে নিজের আগে জল ভরতে দেয় না। নরেশ মাস আষ্টেক আগে জলের বখেড়ায় গগনচাঁদকে বলেছিল—আপনার খুব তেল হয়েছে। তাতে গগনচাঁদ তার গলাটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে চড়

তুলে বলেছিল—এক থাপ্পড়ে তিন ঘণ্টা কাঁদাব। সেই থেকে কথা বন্ধ।

গগন গুঁড়োমশলা কিনতে যাবে কোন্ দুঃখে! ভেজাল আর ধুলোবালি মেশানো ঐ অখাদ্য কেউ খায়? তাছাড়া হামানদিস্তায় মশলা গুঁড়ো করলে শরীরটাকে আরো কিছু খেলানো হয়। শরীর খেলাতে গগনের ক্লান্তি নেই।

গ্যারাজের দরজা মস্ত বড়। বাতাস এসে কেরোসিনের স্টোভে আগুনটাকে নাচায়। গগন উঠে গিয়ে টিনের পাল্লা ভেজিয়ে দিতে যাচ্ছিল। নজরে পড়ল আকাশে মেঘ চমকাচ্ছে। গ্রীষ্মের শেষ, এবার বাদলা শুরু হবে। ঠাণ্ডা ভেজা একটা হাওয়া এল। গগন ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। অন্য ঋতু ততটা নয় যতটা এই বাদলা দিনগুলো তাকে জ্বালায়। গ্যারাজের ভিত নীচু, রাস্তার সমান সমান। একটু বৃষ্টি হলেই কল কল করে ঘরে জল ঢুকে আসে। প্রায় সময়েই বিঘৎ-খানেক জলে ডুবে যায় ঘরটা। সামনের নর্দমার পচা জল। সেই সঙ্গে উচ্চিংড়ে, ব্যাঙ এবং কখনো-সখনো ঢোঁড়া সাপ এসে ঘরে ঢুকে পড়ে। তা সে-সব কীটপতঙ্গ বা সরীসৃপ নিয়ে মাথা ঘামায় না গগন। ময়লা জলটাকেই তার যত ঘেন্না। ছুটো কাঠের তাক করে নিয়েছে, তোরঙ্গটা তার ওপর তুলে রাখে, কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলে স্টোভ জ্বেলে চৌকিতে বসে সাহেবী কায়দায় রান্না করে গগন বর্ষা-কালে। সে বড় ঝঞ্ঝাট। তাই আকাশে মেঘ দেখলে গগন খুশী হয় না।

এখনো হল না। কিন্তু আবার বর্ষা-বৃষ্টিকে সে ফেলতেও পারে না। এই কলকাতার শহরতলীতে বৃষ্টি যেমন তার না-পছন্দ, তেমনি আবার মুরাগাছা গাঁয়ে তার যে অল্প কিছু জমি-জিরেত আছে সেখানে বৃষ্টি না হলে মুশকিল। না হোক বছরে চল্লিশ-পঞ্চাশ মণ ধান তো হয়ই। তার কিছু গগন বেচে দেয়, আর কিছু খোরাকি বাবদ লুকিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে।

মেঘ থেকে চোখ নামিয়েই দেখতে পায় ল্যাম্পপোস্টের আলোর চৌহদ্দি ফুঁড়ে সুরেন খাঁড়া আসছে। সুরেন এক সময় খুব শরীর করেছিল। পেটের পেশী নাচিয়ে নাম কিনেছিল। এখন একটু মোটা হয়ে গেছে। তবু তার দশাসই চেহারাটা রাস্তায় ঘাটে মানুষ দুপলক ফিরে দেখে। সুরেন গুণ্ডামী নষ্টামি করে না বটে, কিন্তু এ তল্লাটে সে চ্যাংড়াদের জ্যাঠামশাই গোছের লোক। লরীর ব্যবসা আছে, আবার একটা ভাতের হোটেলও চালায়।

সুরেন রাস্তা থেকে গোঁত্তা-খাওয়া ঘুড়ির মত ঢুকে এল গ্যারাজের দিকে।

বলল—কাল রাত থেকে লাশটা পড়ে আছে লাইন ধারে। এবার গন্ধ ছাড়বে।

গম্ভীর গগন বলল—হুঁ।

—ছোকরাটা কে তা এখনো পর্যন্ত বোঝা গেল না। তুমি গিয়ে দেখে এসেছ নাকি ?

—না। শুনেছি।

ঘরে ঢুকে সুরেন চৌকির ওপর বসল। বলল—প্রথমে শুনেছিলাম খুন! গিয়ে দেখি তা নয়। কোনখানে চোট-ফোট নেই। রাতের শেষ ডাউন গাড়িটাই টক্কর দিয়ে গেছে। কচি ছেলে, সতেরো-আঠার বছর হবে বয়স। বেশ ভাল পোশাক-টোশাক পরা, বড় চুল, জুলপী, গোঁফ সব আছে।

—হুঁ। গগন বলল।

হামানদিস্তার প্রবল শব্দ হচ্ছে। ভাত নেমে গেল, কড়া চাপিয়ে জিরে-ফোড়ন ছেড়ে দিয়েছে গগন। সঙ্গে একটা তেজপাতা। সাঁতলানো হয়ে গেলেই মশলার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ঝোল চাপিয়ে দেবে।

সুরেন খাঁড়ার খুব ঘাম হচ্ছে। টেরিলিনের প্যাণ্ট আর শার্ট পরা, খুব টাইট হয়েছে শরীরে। বুকের বোতাম খুলে দিয়ে বলল—বড্ড গুমোট গেছে আজ। বৃষ্টিটা যদি হয়!

—হবে। গগন বলে—হলে আর তোমার কি! দোতলা হাঁকড়েছ, টঙের ওপর উঠে বসে থাকবে।

সুরেন ময়লা রুমালে ঘাড়ের ঘাম মুছে ফেলল, তারপর সেটা গামছার মত ব্যবহার করতে লাগল মুখে আর হাতে। ঘষে ঘষে ঘাম মুছতে মুছতে বলে—তোমার ঘরে গরম বড় বেশী, ড্রেনের পচা গন্ধে থাক কি করে?

—প্রথমে পেতাম গন্ধটা। এখন সয়ে গেছে, আর পাই না। চার সাড়ে চার বছর একটানা আছি।

—তোমার ওপরতলার নরেশ মজুমদার হারামজাদা তো আবার বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে ঝিল রোডে। একতলা শেষ, দোতলারও ছাদ যখন-তখন ঢালাই হয়ে যাবে। একবার ধরে পড়ো না, নীচের তলাকার একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে দেবে সস্তায়।

গগন ভাতের ফ্যান-গালা সেরে ঝোলের জল ঢেলে দিল। তারপর গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলল—তা বললে বোধ হয় দেয়। ওর বৌ শোভারাণী খুব পছন্দ করে কিনা আমাকে। একটু আগেও আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করছিল।

—একদিন উঠে গিয়ে ঝাপড় মারবে একটা, আর রা কাটবে না।

গগন মাথা নেড়ে বলে—ফুঁঃ! একে মেয়েছেলে, তার ওপর বৌ মানুষ। বলে হাসে গগন। একটু গলা উঁচু করে, যেন ওপরতলায় জানান্ দেওয়ার জন্যই বলে—দিক না একটু গাল-মন্দ, আমার তো বেশ মিঠে লাগে। বুঝলে হে সুরেন, আদতে ও মাগী আমাকে পছন্দ করে, তাই ঝাল ঝেড়ে সেটা জানিয়ে দেয়। মেয়েমানুষের স্বভাব জান তো, যা বলবে তার উল্টোটা ভাববে।

বলেই একটু উৎকর্ণ হয়ে থাকে গগন। সুরেনও ছাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মুখে একটু হাসি দুজনেরই। শোভারাণীর অবশ্য কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ওপরে কোন বাচ্চা বুঝি স্কিপিং

করছে, তারই টিপ টিপ শব্দ আসছে, আর মেঝেতে ঘুরন্ত দড়ির ঘষা লাগার শব্দ।

নরেশচন্দ্র বড় চতুর বাড়িওলা। ভাড়াটে ওঠানোর দরকার পড়লেই সে অন্য কোন বখেড়ায় না গিয়ে বৌ শোভারাণীকে টুইয়ে দেয়। শোভার মুখ হল আস্তাকুঁড়। সে তখন সেই ভাড়াটের উদ্দেশে আস্তাকুঁড়ের ঢাকনা খুলে আবর্জনা ঢালতে শুরু করে। সে বাক্য যে শোনে তার কান দিয়ে তপ্ত সিসে ঢালার চেয়েও বেশী কষ্ট হয়। সে বাক্য শুনলে গত জন্মের পাপ কেটে যায় বুঝি। শোভারাণী অবশ্য এমনি এমনি গাল পাড়ে না। নতুন ভাড়াটে এলেই তার ঘরদোরে আপনজনের মত যাতায়াত শুরু করে, বাটি বাটি রান্না করা খাবার পাঠায়, দায়ে-দফায় গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। ঐভাবেই তাদের সংসারের হাল-চাল, গুপ্ত খবর সব বের করে আনে। কোন সংসারে না ছুটো চারটে গোপন ব্যাপার আছে! সেই সব খবরই গুপ্ত অস্ত্রের মত শোভার ভাঁড়ারে মজুত থাকে। দরকার মত কিছু রং-পালিশ করে এবং আরো কিছু বানানো কথা যোগ করে শোভা দিন-রাত চেঁচায়। ভাড়াটে পালানোর পথ পায় না। গগনও শোভার দম দেখে অবাক হয়ে বলে—এ তো হামিদা বানুর চেয়ে বেশী কলজের জোর দেখতে পাই!

একমাত্র গগনেরই কিছু তেমন জানে না শোভা। না জানলেও আটকায় না। যেদিন নরেশকে ঝাঁকি দিয়েছিল গগন, সেদিন শোভারাণী একনাগাড়ে ঘণ্টা আষ্টেক গগনের তাবৎ পরিবারের শ্রাদ্ধ করেছিল। বেশ্যার ছেলে থেকে শুরু করে যত রকম বলা যায়। গগন গায়ে মাখেনি, তবে ক্লাবের ছেলেরা পরদিন সকালে এসে বাড়ি ঘেরাও করে। ব্রজ দত্ত নামে সব চেয়ে মারকুট্টা যে চেলা আছে গগনের সে দোতলায় উঠে নরেশকে ডেকে শাসিয়ে দিয়ে যায়। মারত, কিন্তু গগন ওরকমধারা ছুর্বলের গায়ে হাত তোলা পছন্দ করে না বলে মারেনি। তাতে শোভারাণীর মুখে কুলুপ পড়ে যায়। কিন্তু রাগটা

তো আর যায় নি। বিশেষতঃ গগন তখনো ইচ্ছেমত জল তোলে, কলে কোনদিন জল না এলে নরেশের চাকরকে ডেকে ওপরতলা থেকে বালতি বালতি জল আনিয়ে নেয়। শোভা রাগ করে হয়তো, কিন্তু জল দিয়ে দেয়। ঝামেলা করে না।

ভেবে দেখলে গগন কিছু খারাপ নেই। কেবল ঐ বর্ষাকালটাকেই যা তার ভয়।

—লাশটার কথা ভাবছি, বুঝলে গগন!

—কী ভাবছ?

—এখনো নেয়নি। গন্ধ ছাড়বে।

—নেবে'খন। সময় হলে ঠিক নেবে।

—ছেলেটা এখানকার নয় বোধ হয়। সারাদিনে কম করে দু-চার শ' লোক দেখে গেছে, কেউ চিনতে পারছে না।

—এসেছিল বোধ হয় অন্য কোথা থেকে। ক্যানিং-ট্যানিং-এর ওদিককার হতে পারে।

সুরেন মাথা নেড়ে বলে—বেশ ভদ্রঘরের ছাপ আছে চেহারায়। কসরৎ করা চেহারা।

গগন একটু কৌতূহলী হয়ে বলে—ভাল শরীর?

—বেশ ভাল। তৈরী।

—আহা! বলে শ্বাস ছেড়ে গগন বলে—অমন শরীর নষ্ট করল?

সুরেন খাঁড়া বলে—তাও তো এখনো চোখে দেখোনি, আহা-উহু করতে লাগলে!

—ওসব চোখে দেখা আমার সহ্য হয় না। অপঘাত দেখলেই মাথা বিগড়ে যায়। গত মাঘ মাসে চেতলার দিদিমাকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম কেওড়াতলায়। সেখানে দেখি রাজ্যের কলেজের মেয়ে হাতে বই-খাতা নিয়ে জড়ো হয়েছে। সব মালা আর ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে, একটা খাট ঘিরে ভিড়, শুনলাম কলেজের প্রথম বছরের মেয়ে একটা। সে দেওয়ালীর দিন সিন্থেটিক ফাই-

বারের শাড়ি পরে বেরোতে যাচ্ছিল, আগুন লেগে তলার দিকটা পুড়ে যায়। ঐসব সিন্থেটিক কাপড়ও খুব ডেঞ্জারাস, বুঝলে সুরেন? ওতে আগুন লাগলে তেমন দাউ দাউ করে জ্বলবে না, কিন্তু ফাইবার গলে গায়ের সঙ্গে আঠার মত সেঁটে যাবে, কেউ খুলতে পারবে না। মেয়েটারও তাই হয়েছিল, কয়েক মাস হাসপাতালে থেকে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। ভিড়-টিড় ডিঙিয়ে উঁকি মেরে দেখে তাই তাজ্জব হয়ে গেলাম। ঠোঁট দুটো একটু শুকনো বটে, কিন্তু কি মরি-মরি রূপ, কচি, ফর্সা! ঢল ঢল করছে মুখখানা। বুকের মধ্যে কেমন যে করে উঠল!

সুরেন খাঁড়া বলে—ওরকম কত মরছে রোজ!

গগনচাঁদ ব্যাপারটা 'কত'-র মধ্যে ফেলতে চায় না, বলল—না হে, এ মেয়েটাকে সকলের সঙ্গে এক করবে না। কী বলব তোমাকে, বললে পাপ হবে কিনা তাও জানি না, সেই মরা মেয়েটাকে দেখে আমার বুকে ভালবাসা জেগে উঠল। ভাবলাম, ও যদি এক্ষুনি বেঁচে ওঠে তো ওকে বিয়ে করি। সেই ছেলেবেলা থেকে অপঘাতে মৃত্যুর ওপর আমার বড় রাগ। কেন যে মানুষ অপঘাতে মরে!

সুরেন রুমালে ঘাড় গলা ঘষতে ঘষতে বলে—তোমার শরীরটাই হোঁৎকা, মন বড্ড নরম। মনটা আর একটু শক্ত না করলে কি টিঁকতে পারবে? চারদিকের এত অপঘাত, মৃত্যু, অভাব—এসব সইতে হবে না?

গগনচাঁদ একটু থমকে গিয়ে বলে—তোমাদের এক এক সময়ে এক এক রকমের কথা। কখনো বলছ গগনের মন নরম, কখনো বল গগনের মেজাজটা বড় গরম। ঠিক ঠিক ঠাহর পাও না নাকি!

সুরেন বলে—সে তত্ত্ব এখন থাক, আমি লাশটার কথা ভাবছি।

—ভাবছ কেন?

—ভাবছি ছেলেটার চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে কসরৎ

করত। তুমি তো ব্যায়াম শেখাও, তা তোমার ছাত্রদের মধ্যে কেউ কিনা তা গিয়ে একবার দেখে আসবে নাকি?

গগন ঝোল নামিয়ে এক ফুঁয়ে জনতা স্টোভ নিভিয়ে দিল। বলল—ও, তাই আগমন হয়েছে!

—তাই!

—কিন্তু ভাই, ওসব দেখলে আমার রাতের খাওয়া হবে না।

—খেয়ে নিয়েই চল, আমি ততক্ষণ বসি।

গগন মাথা নেড়ে বলে—তাও হয় না, খাওয়ার পর ওসব দেখলে আমার বমি হয়ে যেতে পারে।

সুরেন বলে—তুমি আচ্ছা লোক হে! বলছি তো তেমন ঘেন্নার দৃশ্য কিছু নয়, কাটা-ফাটা নেই, এক চামচে রক্তও দেখলাম না কোথাও। তেমন বীভৎস কিছু হলে না হয় কথা ছিল।

গগনের চেহারায় যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর শান্ত দৃঢ় ভাবটা থাকে সেটা এখন আর রইল না। হঠাৎ সে ঘামছিল, অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল—কার না কার বেওয়ারিশ লাশ! তোমার তা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন? ছেড়ে দাও, পুলিস যা করার করবে।

সুরেন ভ্রূ কুঁচকে গগনকে একটু দেখল। বলল—সে তো মুখ্যুও জানে। কিন্তু কথা হল, আমাদের এলাকায় ঘটনাটা ঘটে গেল। অনেকের সন্দেহ, খুন। তা সে যাই হোক, ছেলেটাকে চেনা গেলে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। পুলিস কত কি করবে তা তো জানি!

সুরেন এ অঞ্চলের প্রধান। গগন তা জানে। সে নিজে এখানে পাঁচ-সাত বছর আছে বটে, কিন্তু তার প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন কিছু নয়। এক গোটা-পাঁচেক জিমনাসিয়ামের কিছু ব্যায়ামের শিক্ষানবীশ আর স্থানীয় কয়েকজন তার পরিচিত লোক। সুরেনের মত সে এখানকার শিকড়গাড়া লোক নয়। সুরেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব

ভালই, কিন্তু এও জানে, সুরেনের মতে মত না দিয়ে চললে বিস্তর ঝামেলা। সুরেনের টাকার জোর আছে, দলের জোর আছে, নিজেকে সে এ অঞ্চলের রাজা ভাবে। বিপদ সেখানেই, এ অঞ্চলে যা ঘটে সব তার নিজের দায় বলে মনে করে সুরেন। ক্ষেপে গেলে সে অনেক দূর পর্যন্ত যায়।

গগন প্যাণ্ট পরল, জামা গায়ে গলিয়ে নিল। চপ্পল জোড়া পায়ে দিয়ে বলল—চল।

—খেলে না?

—না। যদি রুচি থাকে তো এসেই যা হোক দুটো মুখে দেব। নইলে আজ আর খাওয়া হল না।

॥ দুই ॥

গতবার সন্তু একটা বেড়ালকে ফাঁসী দিয়েছিল। বেড়ালটা অবশ্য খুবই চোর ছিল, ছিনতাই করত, মাঝে-মধ্যে দু'একটা ডাকাতিও করেছে। যেমন সন্তুর ছোট বোন দুধ খেতে পারে না, রোজ সকালে মারধোরের ভয় দেখিয়ে দুধের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, আর তখন খুব অনিচ্ছায় সন্তুর বোন টুটু এক চুমুক করে খায় আর দশ মিনিট ধরে আগড়ম-বাগড়ম বকে, খেলে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই করতে করতে এক ঘণ্টা। ততক্ষণে দুধ ঠাণ্ডা মেরে যায়, মাছি পড়ে। বেড়ালটা এ সবই জেনে তক্কে তক্কে থাকত। এক সময়ে দেখা যেত, প্রায় সকালেই, সে গেলাস কাৎ করে মেঝেময় দুধ ছড়িয়ে চেটে-পুটে খেয়ে গেছে। এটা চুরি। এরকম চুরি সে হামেশাই করত, আর ছিনতাই করত আরো কৌশলে। পাড়ার বাচ্চাদের খাওয়ার সময়টা কি করে যে তার জানা থাকত কে বলবে! ঠিকঠাক খাওয়ার সময়ে হাজির থাকত সে। মুখোমুখি বসে চোখ বুজে ঘুমনোর ভান করত,

আর সুযোগ হলেই এর হাত থেকে, তার পাত থেকে মাছের টুকরো কেড়ে নিয়ে হাওয়া। ডাকাতি করত মা-মাসীদের ওপর। কেউ মাছ কুটছে, গয়লার কাছ থেকে দুধ নিচ্ছে, কি হরিণঘাটার বোতল থেকে দুধ ডেকচিতে ঢালছে, অমনি হুড়ুশ করে কোত্থেকে এসে বাঘের মাসী ঠিক বাঘের মতই অ্যাও করে উঠত। দেখা গেছে মা-মাসীর হাত থেকে মাছ কেড়ে নিতে তার বাধেনি, দুধের ডেকচিও সে ওল্টাতে জানত মা-মাসীর হাতের নাগালে গিয়ে। ওরকম বাঁদর বেড়াল আর একটাও ছিল না। বিশাল সেই হুলোটা অবশ্য পরিপাটি দাঁতে-নখে ইঁদুরও মেরেছে অনেক। সিংহবাড়ির ছন্নছাড়া বাগানটায় একাধিক হেলে আর জাতি সাপ তার হাতে প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছে। গায়ে ছিল অনেক আঁচড়-কামড়ের দাগ, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে প্রায়দিনই তার হাতাহাতি কামড়াকামড়ি ছিল। কুকুররাও, কে জানে কেন, বেশ একটু সমঝে চলত তাকে। রাস্তাঘাটে বেড়াল দেখলেই যেমন কুকুর হামলা করে, তেমন এই হুলোকে কেউ করত না। কে যেন, বোধ হয় রায়েদের বুড়ী মা-ই হবে, বেড়ালটার নাম দিয়েছিল গুণ্ডা। সেই নামই হয়ে গেল। হুলো গুণ্ডা এ পাড়ায় যথেচ্ছাচার করে বেড়াত, ঢিল খেত, লাঠির বাড়ি খেত, গাল তো খেতই।

সন্তুকে দু-দুটো স্কুল থেকে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় যে স্কুলে সে পড়ত তা ছিল সাহেবী স্কুল, খুব আদবকায়দা ছিল, শৃঙ্খলা ছিল। সেখানে ভর্তি হওয়ার কিছু পরেই সন্তুর বাবা অধ্যাপক নানক চৌধুরীকে ডেকে স্কুলের রেক্টর জানালেন —আপনার ছেলে মেন্টালি ডিরেঞ্জড্। আপনারা ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। আমরা আর দু মাস ট্রায়ালে রাখব, তারপর যদি ওর উন্নতি না হয় তো দুঃখের সঙ্গে টি-সি দিতে বাধ্য হব।

নানক চৌধুরী আকাশ থেকে পড়লেন। আবার পড়লেনও না। কারণ তাঁর মনে বরাবরই একটা খটকা ছিল সন্তু সম্পর্কে। বয়সের তুলনায় সন্তু কিছু বেশী নিষ্ঠুর, কখনো কখনো মার খেলে হেসে ফেলে।

এবং এমন সব দুষ্টুমি করে যার কোন মানে হয় না। যেমন সে ছাদের আলসের ওপর সাজিয়ে রাখা ফুলের ভারী টবের একটা দুটো মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে নীচের রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। রাস্তায় হাজার লোকে চলে। একবার একটা সন্তুর বয়সী ছেলেরই মাথায় একটা টব পড়ল। সে ছেলেটা দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে যখন ছাড়া পেল তখন বোধবুদ্ধিহীন জরদগব হয়ে গেছে। যেমন সে একবার সেফটি-পিন দিয়ে টিয়াপাখির একটা চোখ কানা করে দিয়েছিল। টিয়ার চিৎকারে সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, একটা চোখ থেকে অবিরল রক্ত পড়ছে, লাল অশ্রুর মত। আর পাখিটা ডানা ঝাপটাচ্ছে আর ডাকছে। সে কি অমানুষিক চিৎকার! খাঁচার গায়েই সেফটিপিনটা আটকে ছিল। আর একবার সে তার ছোট বোনকে বারান্দার একধারে দাঁড় করিয়ে খুব কাছ থেকে প্রচণ্ড জোরে গুলতি মারে। মরেই যেত মেয়েটা। বুকে লেগে দমবন্ধ হয়ে অজ্ঞান। হাসপাতালে গিয়ে সেই মেয়েকে ভাল করে আনতে হয়। তাই নানক চৌধুরী অবাক হলেও সামলে গেলেন। তবে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে না গিয়ে সন্তুকে বাড়ি ফিরে একনাগাড়ে মিনিট পনেরো ধরে প্রচণ্ড মারলেন।

দু-মাস পর ঠিক কথামতই টি-সি দিয়ে দিল স্কুল। দ্বিতীয় স্কুলটি অত ভাল নয়। কিন্তু সেখানেও কিছু ডিসিপ্লিন ছিল, ছেলেদের ওপর কড়া নজর রাখা হত। দু-মাস পর সেখান থেকে চিঠি এল— আপনার ছেলে পড়াশুনোয় ভাল, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, তার জন্য আর পাঁচটা ছেলে নষ্ট হচ্ছে।

এক বছর বাদে সন্তু সেকেণ্ড হয়ে ক্লাসে উঠল। কিন্তু প্রমোশনের সঙ্গে তাকে টি-সি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অগত্যা পাড়ার কাছাকাছি একটা গোয়ালমার্কা স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করে এবার নিশ্চিন্ত হয়েছেন নানক চৌধুরী। এই স্কুলে দুষ্টু ছেলের দঙ্গল, তার ওপর গরীব স্কুল বলে কাউকে সহজে তাড়িয়ে দেয় না। বিশেষতঃ সন্তুর বেতন সব সময়ে পরিষ্কার থাকে, এবং

ক্লাসে সে ফার্স্ট হয়। নানক চৌধুরীকে এখন সন্তুর ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হয় না, তিনি নিজের লেখাপড়ায় মগ্ন থাকেন।

সন্তু এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। স্কুলের ফুটবল টিমে সে অপরিহার্য খেলোয়াড়। তা ছাড়া সে একটা ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম শেখে। গগনচাঁদ শেখায়। সন্তুর খুব ইচ্ছে সে ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট নিয়ে ব্যায়াম করে। তাতে শরীরের পেশী খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কিন্তু গগন যন্ত্র ছুঁতেই দেয় না, বলে—ওসব করলে শরীর পাকিয়ে শক্ত জিংড়ে মেরে যাবে, বাড়বে না। গগন তাই ফ্রি-হ্যাণ্ড করায় আর রাজ্যের যোগব্যায়াম, ব্রিদিং, স্কিপিং আর দৌড়। সন্তু অবশ্য সে কথা শোনে না। ফাঁক পেলেই রিং করে, প্যারালাল বার-এ ওঠে, ওজন তোলে, স্প্রিং টানে। গগন দেখলে ঝাপড় মারবে, কিংবা বকবে। তাই প্রায় সময়েই রাতের দিকে জিমনাসিয়ামে যখন গগন থাকে না, দু-চারজন চাকুরে ব্যায়ামবীর এসে কসরৎ করে আর নিজেদের চেহারা আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তখন সন্তু এসে যন্ত্রপাতি নেড়ে ব্যায়াম করে।

গুণ্ডা বেড়ালটাকে গতবার সন্তু ধরেছিল সিংহীদের বাগানে। বাগান বলতে আর কিছু নেই। কোমর-সমান উঁচু আগাছায় ভরে গেছে চারধার। একটা পাথরের ফোয়ারা ভেঙে ফেটে কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা পামগাছের গায়ে বহুদূর পর্যন্ত লতা উঠেছে বেয়ে। সিংহীদের বাড়িতে কেউই থাকে না। বছর দেড়েক আগে বুড়ো নীলমাধব সিংহ মারা গেলেন। হাড়কিপটে লোক ছিলেন। অত বড় বাড়ির মালিক, তবু থাকতেন ঠিক চাকরবাকরের মত, হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা জামা, পায়ে রবারের চটি। একটা চাকর ছিল, সে-ই দেখাশোনা করত। নীলমাধবের একমাত্র ছেলে বিলেতে থাকে, আর কেউ নেই। অসুখ হলে লোকটা ডাক্তার ডাকতেন না, নিজেই হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে বসতেন। বাজার করতেন নিজের হাতে। যত সস্তা জিনিস এনে রান্না করে খেতেন।

বাগানে কাশীর পেয়ারা, সফেদা, আঁশফল বা জামরুল পাড়তে বাচ্চা-কাচ্চা কেউ ঢুকলে লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। একটা সড়ালে কুকুর ছিল, ভারী তেজী, সেটাকেও লেলিয়ে দিতেন। নিজের ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করতেন বসে বসে। একটা বুড়ো হরিণ ছিল, সেটা বাগানে দড়িবাঁধা হয়ে চরে বেড়াত। নীলমাধব পাড়ার লোকজনের সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না, তবে তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে খুশী হতেন, অনেক পুরনো দিনের গল্প ফেঁদে বসতেন। এ অবশ্য নীলমাধবের পৈতৃক সম্পত্তি নয়, দূর-সম্পর্কের জ্যাঠার সম্পত্তি। নিঃসন্তান জ্যাঠা মারা গেলে দেখা যায় উইল করে তিনি নীলমাধবকেই সব দিয়ে গেছেন। লোকে বলে, নীলমাধব এক তান্ত্রিকের সাহায্যে বাণ মেরে জ্যাঠাকে খুন করে সম্পত্তি পান। লোকের ধারণা, নীলমাধব তাঁর স্ত্রীকেও খুন করেছিলেন। এ সবই অবশ্য গুজব, কোন প্রমাণ নেই। তবে কথা চলে আসছে।

সন্তু একবার নীলমাধবের হাতে ধরা পড়েছিল। সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

চিরকালই জীবন্ত কোন কিছু দেখলেই তাকে উত্যক্ত করা সন্তুর স্বভাব, সে মানুষ বা জন্তু যাই হোক। তাদের একটা চাকর ছিল মহী। লোকটা চোখে বড় কম দেখত। তার সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেই সন্তু তাকে বরাবর—মহীদা, গাড়ি আসছে···এই বলে হাত ধরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিত। এবং মহী কয়েকবারই এরকমভাবে বিপদে পড়েছে। সন্তু তাকে বার-দুই নালার মধ্যেও ফেলে দেয়। এরকমই ছিল তার স্বভাব। তখন সিংহীদের বাগানের বুড়ো হরিণটাকে সে প্রায়ই ঢিল মারত। সিংহীদের বাগানের ঘর-দেয়াল অনেক জায়গায় ভেঙে ফেটে গেছে। টপকানো খুব সোজা। প্রায় দুপুরেই সন্তু দেয়াল টপকে আসত, বাগানে ঘুরত-টুরত, আর বাঁধা হরিণটাকে তাক করে গুলতি মারত। হরিণটার গায়ে চমৎকার

কয়েকটা দাগ ছিল, সেই দাগগুলো লক্ষ্য করে গুলতি দিয়ে নিশানা অভ্যাস করত সে। আর তার লক্ষ্য ছিল, হরিণের চমৎকার কাজল-টানা চোখ। কখনো বা গাছের মত দুটি প্রকাণ্ড শিংকেও লক্ষ্য করে ঢিল মারত সে। একবার সে হরিণটাকে দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে বাগানের উত্তর দিকে একটা গহীন লতানে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে আটকে দেয়।

সন্তু জানত না যে বুড়ো নীলমাধবের দুরবীন আছে। এবং প্রায়দিনই নীলমাধব দুরবীন দিয়ে তাকে খুঁজত। একটা দুষ্টু ছেলে যে হরিণকে ঢিল মারে সেটা তাঁর জানা ছিল। প্রিয় হরিণের গায়ে তিনি দাগ খুঁজে পেতেন।

হরিণকে লতাগাছে আটকে দেওয়ার পরদিনই সন্তু ধরা পড়ে। সন্তু রোজকার মতই দুপুরে বাগানে ঢুকেছে, পকেটে গুলতি, চোখে শ্যেনদৃষ্টি। চারদিক রোদে খাঁ খাঁ করছে সিংহীবাগান। হরিণ চরছে। গাছে গাছে পাখি ও পতঙ্গের ভিড়। শিরীষ গাছে একটা মৌচাক বাঁধছে মৌমাছিরা। বর্ষা তখনো পুরোপুরি আসেনি। চারধারে একপশলা বৃষ্টির পর ভ্যাপসা গরম।

সফেদা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সন্তু ফল দেখছিল। খয়েরি রঙের কী ফল ফলেছে গাছে। ভারে নুয়ে আছে গাছ। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে এক থোপা ফল ধরেও ফেলেছিল সন্তু। সেই সময়ে পায়ের শব্দ পেল, আর খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক। তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। তিন ধার থেকে তিনজন আসছে। এক দিক থেকে আসছে কুকুরটা, অন্য ধার থেকে চাকর, আর ঠিক সামনে একনলা বন্দুক হাতে নীলমাধব সিংহ। একটা লাফ দিয়ে সন্তু দৌড়েছিল। পারবে কেন? মস্ত সড়ালে কুকুরটাই তাকে পেল প্রথম। পায়ের ডিমে দাঁত বসিয়ে জন্তুটা ঘাস-জঙ্গলে পেড়ে ফেলল তাকে। পা তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কুকুরটা তার বুকের ওপর খাপ পেতে আধখানা শরীরের ভার দিয়ে

চেপে রেখেছে। আর ধারালো ঘাসের টানে কেটে যাচ্ছে সন্তুর কানের চামড়া। ডলা ঘাসের অদ্ভুত গন্ধ আসছে নাকে। বুকের ওপর বন্দুকের নল ঠেকিয়ে নীলমাধব বললেন—ওঠো। চাকরটা এসে ঘাড় চেপে ধরল। সন্তু কোন কথাই বলতে পারছিল না।

বুড়ো নীলমাধব নিয়ে গেলেন সেই বিশাল বাড়ির ভিতরে। সেইখানে অত ভয়ভীতির মধ্যেও ভারি লজ্জা পেয়েছিল সন্তু দেয়ালে দেয়ালে সব প্রকাণ্ড মেমসাহেবদের ন্যাংটো ছবি, আর বড় বড় উঁচু টুলে ঐরকমই ন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথরের মূর্তি দেখে।

সব শেষে একটা হলঘর। সেইখানে এনে দাঁড় করালেন নীলমাধব। মুখে কথা নেই। সিলিং থেকে একটা দড়ি টাঙানো, দড়ির নীচের দিকে ফাঁস, অন্য প্রান্তটা সিলিংয়ের আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরে এসে কাছেই ঝুলছে।

নীলমাধব বললেন—তোমার ফাঁসি হবে।

এই বলে নীলমাধব দড়িটা টেনে-টুনে দেখতে লাগলেন। চাকরটাকে বললেন একটা টুল আনতে। কুকুরটা আশেপাশে ঘুর ঘুর করছিল। সন্তু বুঝল এইভাবেই ফাঁসী হয়। কিছু করার নেই।

গলায় সেই ফাঁস পরে টুলের ওপর ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকেছিল সন্তু। চোখের পাতা ফেলেনি। অন্য প্রান্তের দড়িটা ধরে থেকে সেই এক ঘণ্টা নীলমাধব বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতাটা খুব খারাপ লাগেনি সন্তুর। নীলমাধবের পূর্বপুরুষরা কিভাবে বাঘ ভালুক এবং মানুষ মারতেন তারই নানা কাহিনী। শেষ দিকটায় সন্তুর হাই উঠছিল। আর তাই দেখে নীলমাধব ভারী অবাক হয়েছিলেন।

যাই হোক, এক ঘণ্টা পর নীলমাধব তাকে টুল থেকে নামিয়ে একটা চাবুক দিয়ে গোটা কয় সপাং সপাং মারলেন। বললেন—ফের যদি বাগানে দেখি তো পুঁতে রাখব মাটির নীচে!

এই ঘটনার পর নীলমাধব বেশিদিন বাঁচেননি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিণটা মারা যায়। সড়ালে কুকুরটাকে নিয়ে

কেটে পড়ে চাকরটা। কেবলমাত্র নীলমাধবের পেয়ারের হুলো বেড়ালটাই অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াত পাড়ায় পাড়ায়। বড়লোকের বেড়াল বলেই কি না কে জানে, তার মেজাজ অন্য সব বেড়ালের চেয়ে অনেক কড়া ধাতের। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, গুণ্ডামি কোনটাই আটকাত না।

কে একজন রটাল, নীলমাধব মরে গিয়ে বেড়ালটায় ভর করে আছেন।

বিলেত থেকে কলকাঠি নেড়ে নীলমাধবের ছেলে কি করে যেন বাড়ি বিক্রি করে দিল। শোনা যাচ্ছে, এখানে শীগগির সব বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠবে।

তা সে উঠুক গে। গতবারের কথা বলে নিই আগে। হুলো গুণ্ডা বেড়ালকে সিংহীদের বাগানেই তক্কে তক্কে থেকে একদিন পাকড়াও করে সন্তু। ডাকাবুকো ছেলে। বেড়ালটার গলায় দড়ি বেঁধে সেই বাড়িটায় ঢুকে যায়। এবং খুঁজে খুঁজে ছাড়া-বাড়ির জানালা টপকে ভিতরে ঢুকতেই ফাঁসির হলঘরে আসে। সিলিং থেকে দড়ি টাঙানোর সাধ্য নেই। সে চেষ্টাও করে নি সন্তু।

একটা মোটা ভারী চেয়ারে দড়িটা কপিকলের মত লাগিয়ে বেড়ালটাকে অন্য প্রান্তে বেঁধে সে বলল—তোমার ফাঁসি হবে। বলেই দড়ি টেনে দিল।

এসময়ে এক বজ্রগম্ভীর গলা বলল—না, হবে না!

চমকে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখল সন্তু। হাতের দড়ি সেই ফাঁকে টেনে নিয়ে গলায় দড়ি সমেত গুণ্ডা পালিয়ে যায়।

কাকে দেখেছিল সন্তু তা খুবই রহস্যময়। সন্তু কিছু মনে করতে পারে না। সে চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখছিল, এসময় কে তাকে মাথার পিছন দিকে ভারী কোন কিছু দিয়ে মারে। সন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যের পর নানক চৌধুরী এক অচেনা লোকের টেলিফোন

পেয়ে সিংহীদের বাড়িতে লোকজন নিয়ে গিয়ে সন্তুকে উদ্ধার করে আনেন। এরপর দিন-সাতেক সন্তু ব্রেন-ফিবারে ভোগে। তারপর ভাল হয়ে যায়। এবং এ ঘটনার পর গুণ্ডাকেও এ লোকালয়ে আর দেখা যায় নি। একটা বেড়ালের কথা কে-ই বা মনে রাখে!

সন্তুর কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, অলক্ষ্যে তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ আছে। সিংহদের বাড়িতে যে লোকটা তাকে মেরেছিল সে বাস্তবিক তার শত্রু নাও হতে পারে। তার বাবা নানক চৌধুরী মানুষটা খুবই নির্বিকার প্রকৃতির লোক। এ ঘটনার পর নানক চৌধুরী থানা-পুলিস করে নি। ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করেছে। সন্তুকেও তেমন জিজ্ঞাসাবাদ করে নি। এমন কি কে একজন যে নিজের নাম গোপন রেখে টেলিফোন করেছিল তারও খোঁজ করার চেষ্টা করে নি। নানক চৌধুরী লোকটা ওইরকমই, প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তি আর নগদ টাকা আছে। বিবাহসূত্রে শ্বশুরবাড়ির দিক থেকেও সম্পত্তি পেয়েছে, কারণ বড়লোক শ্বশুরের ছেলে ছিল না, মাত্র দুটি মেয়ে। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তি দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নানক চৌধুরীর শালী, অর্থাৎ সন্তুর মাসীর ছেলেপুলে নেই। বয়স অবশ্য বেশী নয়, কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেছে তার সন্তান-সম্ভাবনা নেই। সেই শালী সন্তুকে দত্তক চেয়ে রেখেছে। সন্তুর মা একমাত্র ছেলেকে বোনের কাছে দিতে রাজী হয় নি। সন্তুর মাসী যদি অন্য কাউকে দত্তক না নেয় তবে তার সম্পত্তিও হয়তো একদিন সন্তুই পাবে। মাসী সন্তুকে বড় ভালবাসে। সন্তুও জানে, একমাত্র মাসী ছাড়া তাকে আর কেউ নিখাদ ভালবাসে না। যেমন মা—মা কোনদিন সন্তুর সঙ্গে তার বোনকে কোথাও বেড়াতে পাঠায় না বা একা খেলতে দেয় না। তার সন্দেহ, সন্তু ছোট বোনকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। বাবা সন্তুর প্রতি খুবই উদাসীন। কেবল মাঝে মাঝে পেটানো ছাড়া

সন্তুর অস্তিত্বই নেই তার কাছে। লোকটা সারাদিনই লেখাপড়া নিয়ে আছে। বই ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

সন্তুর সঙ্গী-সাথী প্রায় কেউই নেই। তার কারণ, প্রথমতঃ সন্তু বন্ধুবান্ধব বেশী বরদাস্ত করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সে কাউকেই খুব একটা ভালবাসতে পারে না। তৃতীয়তঃ সে যে ধরনের দুষ্টুমি করে সে ধরনের দুষ্টুমি খুব খারাপ ছেলেরাও করতে সাহস পায় না। সন্তু তাই একরকম একা। দু'চারজন সঙ্গী তার কাছে আসে বটে, কিন্তু কেউই খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

কাল সন্ধ্যেবেলা সন্তু জিমনাসিয়াম থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল, সেই সময়ে কালুর সঙ্গে দেখা। কালুর বয়স বছর ষোলোর বেশী নয়। সন্তুদের ইস্কুলেই পড়ত, পড়া ছেড়ে দিয়ে এখন রিকশা চালায়। তবে রিকশা চালানো ছাড়া তার আরো কারবার আছে। স্টেশনে, বাজারে, লাইনের ধারে সে প্রায়ই চুরি ছিনতাই করে। কখনো ক্যানিং বা বারুইপুর থেকে চাল নিয়ে এসে কালোবাজারে বেচে। এই বয়সেই সে মদ খায় এবং খুব হুল্লোড়বাজী করে। সন্তুর সঙ্গে তার খুব একটা খাতির কখনো ছিল না। কিন্তু দেখা হলে তারা দুজনে দুজনকে 'কি রে, কেমন আছিস' বলে।

কাল কালু একটু অন্যরকম ছিল। সন্তু ওকে দূর থেকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েই বুঝল, কালু মদ খেয়েছে। রিকশায় প্যাড্‌ল মেরে গান গাইতে গাইতে আসছে। চোখ দুটো চক-চকে। সন্তুকে দেখেই রিকশা থামিয়ে বলল—উঠে পড়্‌!

সন্তু ভ্রূ কুঁচকে বলল—কোথায় যাব?

—ওঠ্‌ না। তোকে একটা জিনিস দেখাব, এইমাত্র দেখে এলাম।

কৌতূহলী সন্তু উঠে পড়ল। কালু রিকশা ঘুরিয়ে পালবাজার পার হয়ে এক জায়গায় নিয়ে গেল তাকে। রিকশার বাতিটা খুলে হাতে নিয়ে বলল—আয়।

তারপর খানিক দূর তারা নির্জন পথহীন জমি ভেঙে রেল লাইনে উঠে এল। সেখানে একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তার দাগ। আর একটু দূরেই একটা ছেলে পড়ে আছে।

কালু বলল—এই মার্ডারটা আমার চোখের সামনে হয়েছে!

—ছেলেটা কে?

—চিনি না। তবে মার্ডারটা কে করেছে তা বলতে পারি।

—কে?

কালু খুব ওস্তাদী হেসে বলল—যে পাঁচশো টাকা দেবে তাকে বলব। তোকে বলব কেন?

॥ তিন ॥

সুরেন খাঁড়া আর গগনচাঁদ রেল লাইনের ওপর উঠে এল: এ জায়গাটা অন্ধকার। লোকজন এখন আর কেউ নেই। সুরেন খাঁড়া টর্চ জ্বেলে চারিদিকে ফেলে বলল—হল কি? এইখানেই তো ছিল!

গগনচাঁদ ঘামছিল। অপঘাতের মড়া দেখতে তার খুবই অনিচ্ছা। বলতে কি রেলের উঁচু জমিটুকু সে প্রায় চোখ বুজেই পার হয়ে এসেছে। সুরেনের কথা শুনে চোখ খুলে বলল—নেই?

—দেখছি না।

এই কথা বলতেই সামনের অন্ধকার থেকে কে একজন বলল—এই তো একটু আগেই ধাঙড়রা নিয়ে গেছে, পুলিস এসেছিল।

সুরেন টর্চটা ঘুরিয়ে ফেলল মুখের ওপর। লাইনের ধারে পাথরের স্তূপ জড়ো করেছে কুলিরা। লাইন মেরামত হবে। সেই একটা গিট্টুঠি পাথরের স্তূপের ওপর কালু বসে আছে।

সুরেন খাঁড়া বলে—তুই এখানে কি করছিস ?

—হাওয়া খাচ্ছি। কালু উদাস উত্তর দেয়।

—কখন নিয়ে গেল ?

—একটু আগে। ঘণ্টা দুয়েক হবে।

—পুলিস কিছু বলল ? সুরেন জিজ্ঞেস করে।

ফের টর্চটা জ্বালতেই দেখা গেল, কালুর পা লম্বা হয়ে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে এসেছে। ভূতের পায়ের মত, খুব রোগা পা। আর পায়ের পাতার কাছেই একটা দিশী মদের বোতল আর শালপাতার ঠোঙা।

কালু একটু নড়ে উঠে বলে—পুলিস কিছু বলে নি। পুলিস কখনো কিছু বলে না। কিন্তু আমি সব জানি।

—কি জানিস ?

কালু মাতাল গলায় একটু হেসে বলে—সব জানি !

সুরেন খাঁড়া একটু হেসে বলে—হাওয়া খাচ্ছিস, না আর কিছু ?

কালু তেমনি নির্বিকার ভাবে বলে—যা পাই খেয়ে দিই। পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই আরাম। জায়গাটা ভরাট রাখা নিয়ে হচ্ছে কথা।

—ইঃ, মস্ত ফিলজফার !

কালু ফের মাতাল গলায় হাসে।

—পুলিসকে তুই কিছু বলেছিস ? সুরেন জিজ্ঞেস করে।

—না। আমাকে কিছু তো জিজ্ঞেস করে নি। বলতে যাব কোন্ দুঃখে ?

—জিজ্ঞেস করলে কি বলতিস ?

—কি জানি !

—শালা মাতাল ! সুরেন বলে।

মাথা নেড়ে কালু বলে—জাতে মাতাল হলে কি হয়, তালে ঠিক আছে। সব জানি।

—ছেলেটা কে জানিস্ ?

—আগে জানতাম না। একটু আগে জানতে পারলাম।

—কে ?

—বলব কেন ? যে ছেলেটাকে খুন করেছে তাকেও জানি।

—খুন ! একটু অবাক হয় সুরেন—খুন কি রে ? সবাই বলছে, রাতে ট্রেনের ধাক্কায় মরেছে !

মাথা নেড়ে কালু বলে—সন্ধ্যের আগে এইখানে খুন হয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি। মাথায় প্রথমে ডাণ্ডা মারে, তখন ছেলেটা পড়ে যায়। তারপর গলায় কাপড় জড়িয়ে গলা টিপে মারে। আমি দেখেছি।

—কে মারল ?

—বলব কেন ? পাঁচশো টাকা পেলে বলব !

—পুলিস যখন ধরে নিয়ে গিয়ে পেঁদিয়ে কথা বার করবে তখন কি করবি ?

—বলব না। যে খুন করেছে সে যদি পাঁচশো টাকা দেয় তো কিছুতেই বলব না।

—ঠিক জানিস তুই ?

—জানাজানি কি ! দেখেছি !

—বলবি না ?

—না।

গগনচাঁদ এতক্ষণ কথা বলে নি। এইখানে একটা মৃত্যু ঘটেছে, এই ভেবে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। এবার থাকতে না পেরে বলল—খুনের খবর চেপে রাখিস না। তোর বিপদ হবে।

—আমার বিপদ আবার কি ! আমি তো কিছু করি নি। কালু বলল।

—দেখেছিস তো ! সুরেন খাঁড়া বলে।

—দেখলে কি ?

—দেখলে বলে দিতে হয়। খুনের খবর চাপতে নেই। সুরেন নরম সুরে বলে।

কালু একটা হাই তুলে বলে—তাহলে দেখি নি।

—শালা মাতাল! সুরেন হেসে গগনচাঁদের দিকে তাকায়।

কালু একটু কর্কশ স্বরে বলে—বার বার মাতাল বলবেন না। সব শালাই মাল টানে। আপনিও টানেন।

সুরেন একটা অস্ফুট শব্দ করল। ইদানীং সে বড় একটা হাঙ্গামা-হুজ্জৎ করে না। কিন্তু এখন হঠাৎ গগনচাঁদ বাধা দেওয়ার আগেই অন্ধকারে দশাসই শরীরটা নিয়ে দুই লাফে এগিয়ে গেল। আলগা নুড়ি পাথর খসে গেল পায়ের তলায়। ঠাস্ করে একটা প্রচণ্ড চড়ের শব্দ হল। কালু একবার 'আঁউ' করে চেঁচিয়ে চুপ করে গেল। আলগা পাথরে পা হড়কে সুরেন পড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে কালুকে দেখা যাচ্ছিল না। তবে সে-ও পড়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছিল। এই সময়ে কাছেই একটা বাজ ফেটে পড়ল। বাতাস এল এলোমেলো। বৃষ্টির ফোঁটা চড়-বড় করে পড়ছে।

সুরেন টর্চটা জ্বালতে গিয়ে দেখে, আলো জ্বলছে না। একটা কাতর শব্দ আসে পাথরের স্তূপের ওধার থেকে। সুরেন একটা মাঝারি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেই শব্দটা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। বলে—শালা যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

কাতর শব্দটা থেমে যায়।

গগনচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ পায় সে। আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। খুব দুর্যোগ আসবে। গ্যারাজঘরের অবস্থাটা কি হবে, ভাবছিল সে। বৃষ্টিতে তার বড় বিপদ।

সুরেন দাঁড়িয়ে নিজের ডান হাতের কনুইটা টিপে টিপে অনুভব করছে। বলে—শালা জোর লেগেছে! রক্ত পড়ছে!

আবার বিদ্যুৎ চমকায়। আবার। গগনচাঁদ দেখতে পায়, কালু

লাইনের ধারে পড়ে আছে, তার ডান হাতটা রেল লাইনের ওপরে পাতা। মুহুর্মুহু গাড়ি যায়। যে-কোন মুহূর্তে ওর ডান হাতটা ফু-ফালা করে বেরিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতেই খুব ক্ষীণ হলুদ একটা আলো এসে পড়ল লাইনের ওপর। বহুদূরে অন্ধকারের কপালে টিপের মত একটা গোল হলুদ আলো স্থির হয়ে আছে। গাড়ি আসছে।

গগনচাঁদ কিছু ধীর-স্থির। টপ করে কোন কাজ করে ফেলতে পারে না। সময় লাগে। এমন কি ভাবনা-চিন্তাতেও সে বড় ধীর। কখন কি করতে হবে তা বুঝে উঠতে সময় লাগে।

তাই সে গাড়ির আলো দেখল, কালুর কথা ভাবল, কি করতে হবে তাও ভাবল। এভাবে বেশ কয়েক সেকেণ্ড সময় কাটিয়ে সে ধীরে-সুস্থে পাথরের স্তূপটা পার হয়ে এল। গাড়িটা আর খুব দূরে নেই। সে নীচু হয়ে পাঁজাকোলা করে কালুকে সরিয়ে আনল লাইন থেকে খানিকটা দূরে। একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা গেছে লাইন ঘেঁষে। এখানে ঘাসজমি কিছু পরিষ্কার। সেখানে শুইয়ে দিল। এবং টের পেল মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। গাড়ির আলোয় দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টির তোড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড চারদিকে। সব কিছু অস্পষ্ট। তাপদগ্ধ মাটি ভিজে এক রকম তাপ উঠেও চারদিক অন্ধকার করে দিচ্ছে।

সুরেন খাঁড়া বলল—ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না। চল।

গগনচাঁদ কালুর বুক দেখল। এত বৃষ্টিতে বুকের ধুকধুকুনিটা বোঝা যায় না। নাড়ি দেখল। নাড়ি চালু আছে।

গগনচাঁদ বৃষ্টির শব্দের ওপর গলা তুলে বলল—জ্ঞান নেই। এ অবস্থায় ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

প্রায় নিঃশব্দে বৈদ্যুতিক ট্রেনটা এল। চলে গেল। আবার দ্বিগুন অন্ধকারে ডুবে গেল জায়গাটা। সুরেনের খেয়াল হল, গাড়িটা ডাউন লাইন দিয়ে গেল। কালুর হাতটা ছিল আপ লাইনের ওপর। এ গাড়িটায় কালুর হাত কাটা যেত না।

সুরেনের গলায় এখনো রাগ। বলল—পড়ে থাক। অনেকদিন শালার খুব বাড় দেখছি। চল, কাকভেজা হয়ে গেলাম।

গগনচাঁদ দেখল, বৃষ্টির জল পড়ায় কালু নড়াচড়া করছে। গগন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলে—তুমি যাও, স্টেশনের শেডের তলায় দাঁড়াও গিয়ে। আমি আর একটু দেখে যাচ্ছি।

মাটি ফুঁড়ে বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে যাচ্ছে এত তোড়! কোন মানুষই দাঁড়াতে পারে না। চামড়া ফেটে যায়। সুরেন একটা বজ্রপাতের শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে বলল—দেরি করো না।

বলে কোলকুঁজো হয়ে দৌড় মারল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির ঝাপটায় কালুর মাথার অন্ধকার কেটে গেছে। গগনচাঁদ অন্ধকারেই তাকে ঠাহর করে বগলের তলায় হাত দিয়ে তুলে বসাল। কালু বসে ফোঁপাচ্ছে।

গগন কালুর মুখ দেখতে পেল না। কেবল অন্ধকারে একটা মানুষের আবছায়া। গগন বলল—ওঠ!

কালু উঠল।

অল্প দূরেই একটা না-হওয়া বাড়ি। ভারা বাঁধা রয়েছে। একতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে, এখন দোতলা উঠছে। পিছল পথ বেয়ে কালুকে ধরে সেইখানেই নিয়ে এল গগনচাঁদ।

গা মুছবার কিছু নেই। সারা গা বেয়ে জল পড়ছে। গগন গায়ের জামাটা খুলে নিংড়ে নিয়ে মাথা আর মুখ মুছল। কালু উবু হয়ে বসে বমি করছে, একবার তাকিয়ে দেখল গগন। বমি করে নিজেই উঠে গিয়ে বৃষ্টির জল হাত বাড়িয়ে কোষে ধরে মুখে-চোখে ঝাপটা দিল।

তারপর ফের মেঝেয় বসে পড়ে বলল—শরীরে কি কিছু আছে নাকি! মাল খেয়ে আর গাঁজা টেনে সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছে!

গগনচাঁদ সে কথায় কান না দিয়ে বলল—তোর রিকশা কোথায়?

—সে আজ মাতু চালাচ্ছে। আমি ছুটি নিয়েছি আজকের দিনটা।

—কেন ?

—মনে করেছিলাম আজ পাঁচশো টাকা পাব।

গগন চুপ করে থাকে। কালুটা বোকা। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে।

গগন বলল—যে ছেলেটা খুন হয়েছে সে এখানকার নয় ?

কালু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভেজা গায়ে বসেছিল। প্রথমটায় উত্তর দিল না।

তারপর বলল—বিড়ি-টিড়ি আছে ?

—আমি তো খাই না।

কালু ট্যাঁক হাতড়ে বলল—আমার ছিল। কিন্তু সব ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে।

ভেজা বিড়ি বের করে কালু অন্ধকারেই টিপে দেখল, ম্যাচিস থেকে এক কোষ জল বেরোল। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা অস্পষ্ট খিস্তি করে কালু বলে—সুরেন শালার খুব তেল হয়েছে গগনদা, জানলে ?

গগন অন্ধকারে কালুর দিকে চাইল। তেল কালুরও হয়েছে। আজকাল সকলেরই খুব তেল।

গগন বলল —ছেলেটা কি এখানকার ?

—কোন্ ছেলেটা ?

—যে খুন হল ?

—সে সব বলতে পারব না।

—কেন ?

—বলা বারণ। কালু উদাস গলায় বলে।

গগনচাঁদ একটু চুপ করে থেকে একটা মিথ্যে কথা বলল—শোন একটু আগে সুরেন যখন তোকে মেরেছিল, তখন তুই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলি। তোর ডান হাতটা রেল লাইনের ওপর গিয়ে পড়েছিল।

আর ঠিক সেই সময়ে গাড়ি আসছিল। আমি তোকে সরিয়ে না আনলে ঠিক তোর হাতটা চলে যেত আজ।

কালু নড়ল না, কেবল বলল—মাইরি!

—তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

কালু হঠাৎ আবার উদাস হয়ে গিয়ে বলল—তাতে কি হয়েছে? তুমি না সরালে একটা হাত চলে যেত! তা যেত তো যেত। এক-আধটা হাত-পা গেলেই কি থাকলেই কি!

গগনচাঁদ একটা রাগ চেপে গিয়ে বলল—দূর ব্যাটা, হাত-কাটা হয়ে ঘুরে বেড়াতিস তাহলে! রিক্সা চালাত কে?

—চালাতাম না। ভিক্ষে করে খেতাম। ভিক্ষেই ভাল, জানলে গগনদা! তোমাদের এলাকার রাস্তাঘাট যা তাতে রিকশা টানতে জান বেরিয়ে যায়। পোষায় না। শরীরেও কিছু নেই।

—কথাটা বলবি না তাহলে?

কালু একটু চুপ করে থেকে বলে—বলল, পাঁচটা টাকা দাও।

গগন একটু অবাক হয়ে বলে—টাকা! টাকা কেন?

—নইলে বলব না।

গগন একটু হেসে বলে—খুব টাকা চিনেছিস! কিন্তু এটা এমন কিছু খবর নয় রে। পুলিসের কাছে গেলেই জানা যায়।

—তাই যাও না।

গগনেরও ইচ্ছে হয় এগিয়ে গিয়ে কালুর গলাটা টিপে ধরে। সুরেন যে ওকে মেরেছে সে কথা মনে করে গগন খুশীই হল। বলল —টাকা অত সস্তা নয়।

—অনেকের কাছে সস্তা।

গগন মাথা নেড়ে বলে—তা বটে। কিন্তু আমার টাকা দামী।

কালু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—দিও না!

গগন একটু ভেবে বলে—কিন্তু যদি পুলিসকে বলে দিই?

—কি বলবে?

—বলব খুনটা তুই নিজের চোখে দেখেছিস!

—বলো গে না. কে আটকাচ্ছে?

—পুলিস নিয়ে গিয়ে তোকে বাঁশডলা দেবে!

—দিক। কালু নির্বিকার ভাবে বলে—অত ভয় দেখাচ্ছ কেন? যে মরেছে আর যে মেরেছে তাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি? যে যার নিজের ধান্দায় কেটে পড় তো। কেবল তখন থেকে খবর বের করার চেষ্টা করছ, তোমাদের এত খতেনে দরকার কি?

গগনচাঁদ ভেবে দেখল, সত্যিই তো। তার তো কিছু যায়-আসে না। কে কাকে খুন করেছে তাতে তার কি? সুরেন খাঁড়া এই ভরসন্ধ্যাবেলা তাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে না আনলে সে মড়া দেখতে আসতও না। তবে ছেলেটা কে মরল সে বিষয়ে একটা কৌতূহল ভিতরে ভিতরে রয়ে গেছে। বিশেষত যখন শুনেছে যে মরা ছেলেটার শরীরটা কসরৎ করা। ভাল শরীরওলা একটা ছেলে মরে গেছে শুনে মনটা খারাপ লাগে। কত কষ্টে এক একটা শরীর বানাতে হয়। সেই আদরের শরীর কাটা-ছেঁড়া হয়ে পুড়বে, ছাই হয়ে যাবে! ভাবতে কেমন লাগে।

বৃষ্টির তোড়টা কিছু কমেছে। কিন্তু এখনো অবিরল পড়ছে। আধখঁ্যাচড়া বাড়িটার জানালা-দরজার পাল্লা বসে নি, ফাঁকা ফোকরগুলি দিয়ে জলকনা উড়ে আসছে। বাতাস বেজায়। শীত ধরিয়ে দিল। এধার ওধার বিস্তর বালি, নুড়িপাথর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কিছু লোহার শিকও। একটা লোক ছাতা মাথায়, টর্চ হাতে উঠে এল রাস্তা থেকে। ছাতা বন্ধ করে টর্চটা একবার ঘুরিয়ে ফেলল গগনচাঁদের দিকে, অন্যবার কালুর দিকে। এক হাতে বাজারের থলি। গলাখঁাকারি দিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে ঘরের দরজায় টিনের অস্থায়ী ঝাঁপ লাগানো। লোকটা ঝাঁপের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। চৌকিদার হবে।

কালু উঠে বলল—দেখি লোকটার কাছে একটা বিড়ি পাই কিনা, বড্ড শীত ধরিয়ে দিচ্ছে !

কালু গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এল। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। বলল—সুরেন শালা জোর মেরেছে, জানলে গগনদা? চোয়ালের হাড় নড়ে গেছে, বিড়ি টানতে টের পেলাম। বসে বসে খায় তো সুরেন, তাই গা-গতরে খাসী, আমাদের মত রিকশা টানলে গতরে তেল জমতে পারত না।

গগন গম্ভীর ভাবে বলে—হুঁ।

হঠাৎ উবু হয়ে বসে বসে বিড়ি টানতে টানতেই বোধ হয় কালুর মেজাজটা ভাল হয়ে গেল। বলল—যে ছেলেটা খুন হয়েছে তাকে তুমি চেনো গগনদা !

গগন বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ভাব-সাব বুঝবার চেষ্টা করছিল। স্টেশনে সুরেন অপেক্ষা করছে। যাওয়া দরকার। কালুর কথা শুনে বলল—চিনি ?

—হুঁ।

—কে রে ?

—এক বাণ্ডিল বিড়ি কেনার পয়সা দেবে তো? আর একটা ম্যাচিস ?

গগন হেসে বলে—খবরটার জন্য দেব না।

—দিও মাইরি। কালু মিনতি করে—আজকের রোজগারটা এমনিতেই গেছে। বিড়ি আর ম্যাচিসও গচ্চা গেল।

গগন বলল—দেব।

কালু বলল—আগে দাও।

গগন দিল।

কালু বলে—ছেলেটা বেগমের ছেলে।

—বেগম কে ?

—তোমার বাড়িওলা নরেশ মজুমদারের শালী। নষ্ট মেয়েছেলে, বাপুজী নগরে থাকে।

—ও। বলে খানিকটা চমকে ওঠে গগন।

—ছেলেটা তোমার আখড়ায় ব্যায়াম করত। সবাই ফলি বলে ডাকে। লোকে বলে, ও নাকি নরেশ মজুমদারেরই ছেলে।

—জানি। এসব কথা চাপা দেওয়ার জন্যই গগন তাড়াতাড়ি বলে—আর কি জানিস?

—তেমন কিছু না। ছেলেটা বহুকাল হল পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। খুব পাজী বদমাশ ছেলে। ইদানীং ট্যাবলেট বেচতে আসত।

—ট্যাবলেট! অবাক মানে গগন।

—ট্যাবলেট, যা খেলে নেশা হয়! প্রথম প্রথম বিনা পয়সায় খাওয়াত ছেলে-ছোকরাদের। তারপর নেশা জমে উঠলে পয়সা নিত। অনেককে নেশা ধরিয়েছে।

—ড্রাগ নাকি? গগন জিজ্ঞেস করে।

—কি জানি কি! শুনেছি খুব সাঙ্ঘাতিক নেশা হয়।

গগন বলল—এ পাড়ায় যাতায়াত ছিল তো, ওকে কেউ চিনতে পারল না কেন?

কালু হেসে বলল—দিনমানে আসত না। রাতে আসত। তাছাড়া অনেকদিন পাড়া ছেড়ে গেছে, কে আর মনে রাখে! আর চিনলেই বা চিনতে চায় ক'জন বল! সবাই চিনি না চিনি না বলে এড়িয়ে যায়। ঝঞ্ঝাট তো।

—নরেশ মজুমদার খবর করে নি?

—কে জানে? জানলে আসত ঠিকই, নিজের সন্তান তো। বোধ হয় খুব ভাল করে খবর পায় নি।

বৃষ্টি ধরে এল। এখনো টিপটিপিয়ে পড়ছে। এই টিপটিপানিটা সহজে থামবে না, লাগাতার চলবে। রাতের দিকে ফের ঝেঁপে আসবে হয়তো।

গগন গলা নামিয়ে বলল—সত্যিই খুন হতে দেখেছিস? নাকি গুল ঝাড়ছিস?

কালু হাতের একটা ঝাপটা মেরে বলে—শুধু শুধু গল্প ফেঁদে লাভ কি! আমার মাথায় অত গল্প খেলে না!

—ছেলেটাকে তুই চিনলি কি করে? গগন জিজ্ঞেস করে।

—কোন্ ছেলেটাকে?

—যে খুন হয়েছে, ফলি!

—প্রথমটায় চিনতে পারি নি। এক কেৎরে উপুড় হয়ে পড়েছিল, একটু চেনা-চেনা লাগছিল বটে। পুলিস যখন ধাঙড় এনে বডি চিৎ করল তখনই চিনতে পারলাম। নামটা অবশ্য ধরতে পারি নি তখনো। পুলিসের একটা লোকই তখন বলল—এ তো ফলি, অ্যাবস্‌কণ্ডার। তখন ঝড়াক করে সব মনে পড়ে গেল। ইদানীং নেশা-ভাং করে মাথাটাও গেছে আমার, সব মনে রাখতে পারি না।

গগন খুব ভেবে বলল—খুনের ব্যাপারটাও মনে না রাখলে ভাল করতিস। যে খুন করেছে সে যদি টের পায় যে তুই সাক্ষী আছিস, তাহলে তোকে ধরবে!

—ধরুক না। তাই তো চাইছি। পাঁচ-কানে কথাটা তুলেছি কেন জানো? যাতে খুনীর কাছে খবর পৌঁছয়!

—পৌঁছলে কি হবে?

—পাঁচশো টাকা পাব, আর খবরটা চেপে যাব।

—ব্ল্যাকমেল করবি কালু?

কালু হাই তুলে বলে—আমি অত ইংরিজি জানি না।

গগন একটা শ্বাস ফেলে বলে—সাবধানে থাকিস।

কালু বলল—ফলিকে তুমি চিনতে পারলে?

গগন মাথা নেড়ে বলে—চিনেছি। আমার কাছে কিছুদিন ব্যায়াম শিখেছিল। লেগে থাকলে ভাল শরীর হত।

—শরীর! বলে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে কালু। বলে—শরীর দিয়ে কি হয় গগনদা? অত বড় চেহারা নিয়েও তো কিছু

করতে পারল না। এক ঘা ডাণ্ডা খেয়ে ঢলে পড়ল। তারপর গলা টিপে···ফুঃ !

গগন টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। তার মাথার মধ্যে বেগম শব্দটা ঘুরছিল। শোভারাণীর বোন বেগম। খুব সুন্দর না হলেও বেগমের চেহারায় কি যেন একটা আছে যা পুরুষকে টানে। এখন বেগমের বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু চেহারা এখনো চমৎকার যুবতীর মত। শোনা যায় তার স্বামী আছে। কিন্তু সেই স্বামী বড় হাবাগোবা মানুষ। কোন একটা কলেজে ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি করে। বেগম তাকে ট্যাঁকে গুঁজে রাখে। আসলে বেগমের যে একজন স্বামী আছে এ খোঁজই অনেকে পায় না। তার বাইরের ঘরে অনেক ছোকরা ভদ্রলোক এসে সন্ধ্যেবেলায় আড্ডা বসায়, তাস-টাস খেলে, নেশার জিনিসও থাকে। লোকে বলে, ঐটেই বেগমের আসল ব্যবসা। আড্ডার নলচে আড়াল করে সে ফুর্তির ব্যবসা করে। তা বেগম থাকেও ভাল। দামী জামাকাপড়, মূল্যবান গৃহসজ্জা, চাকরবাকর দাসদাসী তো আছেই, ইদানীং একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বিলিতি গাড়িও হয়েছে।

কয়েক বছর আগে নিঃসন্তান নরেশ আর শোভা বেগমের ছেলেকে পালবে পুষবে বলে নিয়ে আসে। বেগমও আপত্তি করে নি। তার যা ব্যবসা তাতে ছেলেপুলে কাছে থাকলে বড় ব্যাঘাত হয়। তাই ছোট্ট ফলিকে এনে তুলল নরেশ মজুমদার। লোকে বলাবলি করল যে, নরেশ আসলে নিজের ছেলেকেই জায়গা মত নিয়ে এসেছে। হতেও পারে। বেগমের স্বামীর পৌরুষ সম্পর্কে কারোরই খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই।

ফলিকে এনে নরেশ ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেয়। ছেলেটার খেলাধুলোর প্রতি টান ছিল, তাই একদিন নরেশ তাকে গগনচাঁদের আখড়াতেও ভর্তি করে দিল। কিছু ছেলে থাকে, যাদের শরীরের গঠনটাই চমৎকার। এসব ছেলে অল্প কসরৎ করলেই শরীরের গুপ্ত

এবং অপুষ্ট পেশীগুলি বেরিয়ে আসে। নিখুঁত শরীরের খুব অভাব দেশে। গগনচাঁদ তার ব্যায়ামের শিক্ষকতার জীবনে বলতে গেলে এই প্রথম মজবুত হাড় আর সুষম কাঠামোর শরীর পেল। এক নজর দেখেই গগনচাঁদ বলে দিয়েছিল—যদি খাটো তো তুমি একদিন মিস্টার ইউনিভার্স হবে।

তা হতও বোধ হয় ফলি। কিছুকাল গগনচাঁদ তাকে যোগব্যায়াম আর ফ্রি-হ্যাণ্ড করায়। খুব ভোরে উঠে সে নিজে কেড্‌স্ আর হাফপ্যাণ্ট পরে ফলিকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ত। পুরো চত্বরটা ঘুরে ঘুরে গায়ের ঘাম ঝরাত। তারপর ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আসন করাত। বিকেলে ফের ফ্রি-হ্যাণ্ড। ফলি খানিকটা তৈরী হয়ে উঠতেই তাকে অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতি ধরিয়ে দিয়েছিল গগন। খুব কড়া নজর রাখত, যাতে ফলির শরীরের কোন পেশী শক্ত না হয়ে যায়। যাতে বাড় না বন্ধ হয়। ফলি নিজেও খাটত। আশ্চর্যের বিষয়, কসরৎ করা ছেলেদের মাথা মোটা হয়, প্রায়ই বুদ্ধি বা লেখা-পড়ার দিকে খাঁকতি থাকে। মনটা হয় শরীরমুখী। ফলির সেরকম ছিল না। সে লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। খরবুদ্ধি ছিল তার।

শোভারাণী অবশ্য খুব সন্তুষ্ট ছিল না। প্রায়ই ওপরতলা থেকে তার গলা পাওয়া যেত, নরেশকে বকাবকি করছে—ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে থেকে ফলিটা গুণ্ডা তৈরী হবে। কেন তুমি ওকে ঐ গুণ্ডার কাছে দিয়েছ?

ফলির শরীর সত্য তৈরী হয়ে আসছিল। কত আর বয়স হবে তখন, বড়জোর ষোল! বিশাল সুন্দর দেখনসই চেহারা নিয়ে পাড়ায় যখন ঘুরে বেড়াত তখন পাঁচজনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখত। আর সেইটেই ফলির কাল হল। সেই সময়ে সে পড়ল মেয়েছেলের পাল্লায়। প্রথমে গার্লস স্কুলের পথে একটি মেয়ে তাকে দেখে প্রেমে পড়ে। সেটার গর্দিশ কাটবার আগেই মুন্সীবাড়ির বড় মেয়ে, যাকে স্বামী

নেয় না, বয়সেও যে ফলির চেয়ে অন্তত চৌদ্দ বছরের বড়, সেই মেয়েটা ফলিকে পটিয়ে নিল। সেখানেই শেষ নয়। এ বাড়ির ছোট বৌ, সে বাড়ির ধুমসী মেয়ে, এরকম ডজনখানেক মেয়েছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ফলি, মাত্র ষোল-সতেরো বছর বয়সেই। সম্পর্কটা শারীরিক ছিল, কারণ অত মেয়েছেলের সঙ্গে মিশলে মন বলে বস্তু থাকে না, প্রেম ইত্যাদি ভাবপ্রবণতার ব্যাপারকে ফক্কিকারী বলে মনে হয়।

গগনচাঁদ মেয়েছেলের ব্যাপারে কিছু বিরক্ত ছিল। সে নিজে মেয়েছেলের সঙ্গ পছন্দ করত না। মেয়েছেলে বড় নির্বোধ আর ঝগড়াটে জাত, এই ছিল গগনের ধারণা। এমন নয় যে তার কাম-বোধ বা মেয়েদের প্রতি লোভ নেই। সে সবই ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে সারাদিন ধরে মেলামেশা, এবং মেয়ে-শরীরের অতিরিক্ত সংস্পর্শ তার পছন্দ নয়। উপরন্তু তার কিছু নীতিবোধ এবং ধর্মভয়ও কাজ করে। প্রথমটায় যদিও ফলিকে এ নিয়ে কিছু বলে নি গগন। কিন্তু অবশেষে সেণ্ট্রাল রোডের একটি কিশোরী মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পর গগন আর থাকতে পারে নি। মেয়েটার দাদা আর এক প্রেমিক এ নিয়ে খুব তড়পায়। কিন্তু ফলিকে সরাসরি কিছু করার সাধ্য ছিল না। কারণ ফলির তখন একটা দল হয়েছে, উপরন্তু তার মাসী আর মেসোর টাকার জোর আছে। তাই সেই দাদা আর প্রেমিক দুজনে এসে একদিন গগনকে ধরল। দাদার ইচ্ছে, ফলি মেয়েটিকে বিয়ে করে ঝামেলা মিটিয়ে দিক। আর প্রেমিকটির ইচ্ছে, ফলিকে আড়ংধোলাই দেওয়া হোক বা খুন করা হোক বা পুলিসের হাতে দেওয়া হোক।

কিন্তু গগন ফলির অভিভাবক নয়। সে ফলিকে শাসন করার ক্ষমতাও রাখে না। সে মাত্র ব্যায়াম-শিক্ষক। তবু ফলিকে ডেকে গগন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ফলির গগনের প্রতি কিছু আনুগত্য ও ভালবাসা ছিল তখনো। কারণ গগন বাস্তবিক ফলিকে ভালবাসত।

আর ভালবাসা জিনিসটা কে না টের পায়! কিন্তু ফলিরও কিছু করার ছিল না। মেয়েছেলেরা তার জন্য পাগল হলে সে কী-ই বা করতে পারে! যত মেয়ে তার সংস্পর্শে আসে সবাইকে তো একার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মাত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করাও কি ঠিক? এসব কথা ফলি খোলসা করেই গগনকে বলেছিল।

গগন বুঝল। এবং সে রাতারাতি ফলিকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

ফলি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যায়। তার ফলে শোভারাণী গগনের শ্রাদ্ধ করল কিছুদিন। তার ধারণা, গগনই ফলিকে গুম করেছে। সেটা সত্যি না হলেও ফলির পালানোর পিছনে গগনের যে হাত ছিল তা মিথ্যে নয়। ফলি চলে যাওয়ায় পাড়া শান্ত হল। সেই কিশোরীটির পেটের বাচ্চা নষ্ট করে দিয়ে লোকলজ্জার ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হল। যে সব মেয়ে বা মহিলা ফলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তারা কিছু মুষড়ে পড়ল। তবে অনেক স্বামী এবং অভিভাবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

ফলি কোথায় গিয়েছিল তা কেউ জানে না। তবে সে বেগম অর্থাৎ মায়ের আশ্রয়ে আর যায় নি। কেননা সেখানে গেলেও তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে লোকে বলে যে বেগমের সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখে চলত।

কিন্তু গগন আজ এই ভেবেই খুব বিস্ময় বোধ করছিল যে, ফলির মত বিখ্যাত ছেলের মৃতদেহ দেখেও কেন কেউ সনাক্ত করতে পারল না! ঠিক কথা যে, ফলি বহুদিন হল এ এলাকা ছেড়ে গেছে, তবু তাকে না চিনবার কথা নয়। বিশেষতঃ সুরেন খাঁড়ার তো নয়ই।

রেল লাইন ধরে হেঁটে এসে গগনচাঁদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠল। প্ল্যাটফর্মটা এখন প্রায় ফাঁকা। বুকিং অফিসের সামনে ফলওলারা ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সুরেন সিগারেট টানছে।

গগন কিছু অবাক হল। সুরেন খাঁড়া বড় একটা ধুমপান করে না।

তাকে দেখেই সুরেন এগিয়ে এসে বলল—কী হল ?

গগন কিছু বিস্মিত ভাবেই বলে—তুমি ফলিকে চিনতে পার নি ?

—ফলি! কোন্ ফলি? কার কথা বলছ ?

—যে ছেলেটা মারা গেছে। আমাদের নরেশ মজুমদারের শালীর ছেলে।

সুরেন একটু চুপ করে থেকে বলে—বেগমের সেই লুচ্চা ছেলেটা ?

—সে-ই। তোমার তো চেনা উচিত ছিল। তাছাড়া তুমি যে বয়স বলেছিলে, ফলির বয়স তা নয়। কম করেও উনিশ-কুড়ি বা কিছু বেশীই হতে পারে।

সুরেন গম্ভীর ভাবে বলল—চেনা কি সোজা ? এই লম্বা চুল, মস্ত গোঁফ, মস্ত জুলপি। তা ছাড়া বহুকাল আগে দেখেছি, মনে ছিল না। তবে চেনা-চেনা ঠেকেছিল বটে, তাই তো তোমাকে ধরে আনলাম। ও যে ফলি তা জানলে কি করে!

—কালুর কাছ থেকে বের করলাম। বিড়ি-দেশলাইয়ের পয়সা দিতে হয়েছে।

সুরেন একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বলল—বেটা বেঁচে আছে এখনো ? থাপ্পড়টা তাহলে তেমন লাগেনি।

—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অত জোরে মারা তোমার উচিত হয় নি সুরেন। ওরা সব ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে, জীবনীশক্তি কম, বেমক্কা লাগলে হার্টফেল করতে পারে।

—রাখো রাখো। বোতল বোতল বাংলা মদ সাফ্ করে গাঁজা টেনে রিকশা চালিয়ে বেঁচে আছে, আমার থাপ্পড়ে মরবে ? এত সোজা নাকি! ওদের বেড়ালের জান।

গগনচাঁদ হেসে বলে—তুমি নিজের থাপ্পড়ের ওজনটা জানো না। সে যাক গে, কালু মরে নি। এখন দিব্যি উঠে বসেছে।

—ভাল। মরলেও ক্ষতি ছিল না।

গগন শুনে হাসল।

দুজনে টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে ফিরতে লাগল কেউ কোন কথা বলছে না।

॥ চার ॥

সন্তু একবার উঁকি মেরে তার বাবার ঘর দেখল। তার বাবা নানক চৌধুরী ইদানীং দাড়ি রাখছে। বড় পাগল লোক, কখন কি করে ঠিক নেই। এই হয়তো আধ-হাত দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল হয়ে গেল। ফের একদিন গিয়ে দাড়ি কামিয়ে, মাথা ন্যাড়া করে চলে এল। তবু নানক চৌধুরীকে নিয়ে কেউ বড় একটা হাসাহাসি করে না। সবাই সমঝে চলে। একে মহা পণ্ডিত লোক, তার ওপর রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ব্রজ দত্ত নামে মারকুট্টা ছেলেকেও একবার লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল নানক চৌধুরী। কারণ ব্রজ দত্ত পাড়ার একটা পাগলা ল্যাংড়া লোককে ধরে মেরেছিল। সেই পাগলা আর ল্যাংড়া রমণী বোস নাকি বলে বেড়িয়েছিল যে ব্রজ দত্ত আর সাঙাৎরা একরকম নেশা করে, তা মদের নয় কিন্তু মদের চেয়েও ঢের বেশী সাংঘাতিক।

সন্তু পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে সাবধানে বাবাকে দেখে নেয়। ঘরটা অন্ধকার, কেবল টেবিল ল্যাম্পের ছোট্ট একটু আলো জ্বলছে, আর চৌধুরীর বড়সড় অন্ধকার ছায়ার শরীরটা ঝুঁকে আছে বইয়ের ওপর। পাড়ায় বোমা ফাটলেও নানক চৌধুরী এসময়ে টের পায় না।

কালু আজ সন্তুর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। কাল রাতে লাশ দেখে ফেরার পথে কালু বলেছিল—জানলি সন্তু, খুনটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ভয় খাই যদি শালা খুনেটা জানতে পারে যে আমি দেখেছি তো আমাকেও ফুটিয়ে

দেবে। তাই তোকে সব বলব, কাল সিংহীদের বাগানে রাত আটটায় থাকবি।

সন্তু বলল—কাল কেন ? আজই বল না !

কালু মাথা নেড়ে বলে—আজ নয়। আমি আগে ভেবে-টেবে ঠিক করি, মাথাটা ঠাণ্ডা হোক। আজ মাথাটা গোলমাল লাগছে।

সন্তু বলল—কত টাকা পাবি বললি ?

—পাঁচশো। তাতে ক'দিন ফুর্তি করা যাবে। রিকশা টানতে টানতে গতর ব্যথা। পাঁচশো টাকা পেলে পালবাজারে সব্জীর দোকানও দিতে পারি।

সন্তু ব্ল্যাকমেল ব্যাপারটা বোঝে। সে তাই পরামর্শ দিল—পাঁচশো কেন ? তুই এক হাজারও চাইতে পারিস।

—দেবে না।

—দেবে। খুনের কেস হলে আরও বেশী চাওয়া যায়।

—দূর ! কালু ঠোঁট উল্টে বলে—বেশী লোভ করলেই বিপদ। আজকাল আকছার খুন হয়। ক'জনকে ধরছে পুলিস ! আমাদের আশেপাশে অনেক খুনী ঘুরে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোকের মত। খুনের কেসকে লোকে ভয় পায় না।

সন্তু কাল রাতে ভাল ঘুমোয় নি। বলতে কি সে কাল থেকে একটু অন্যরকম বোধ করছে। খুন সে কখনো দেখে নি বটে, কিন্তু বইতে খুনের ঘটনা পড়ে আর সিনেমায় খুন দেখে সে ইদানীং খুনের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে। তার ওপর যদি সেই খুনের ঘটনার গোপন তথ্যের সঙ্গে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে তবে তো কথাই নেই।

রাত আটটা বাজতে চলল। দেয়ালঘড়িতে এখন পৌনে আটটা। এ সময়ে বাড়ির বাইরে বেরোনো খুবই বিপজ্জনক। নানক চৌধুরী, তার বাবা, যাকে সে আড়ালে নানকু বলে উল্লেখ করে, সে যদি টের পায় তো একতরফা হাত চালাবে। নানক চৌধুরী

ব্যায়ামবীর বা গুণ্ডা-ষণ্ডাকে ভয় পায় না, তা ছেলের গায়ে হাত তুলতে তার আটকাবে কেন ?

তবু যেতেই হবে। সেই ভয়ঙ্কর গুপ্ত খবরটা কালু তাকে দিয়ে যাবে আজ।

সন্তু রবারসোলের জুতো পরে আর একটা তুই সেল-এর টর্চবাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সিংহীদের বাড়ির বাগান ভাল জায়গা নয়। পোড়োবাড়ির মত পড়ে আছে। সেখানে প্রচুর সাপখোপের আড্ডা।

মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। আজ মাস্টারমশাইয়ের আসার দিন নয়। কাজেই সন্তু পড়ার ঘরের বাতিটা জ্বেলে একটা বই খুলে রেখে বেরিয়ে পড়ল। মা যদি আসে তো ভাববে ছেলে পড়তে পড়তে উঠে বাথরুম বা ছাদে গেছে।

খুব তাড়াতাড়ি সন্তু রাস্তা পার হয়ে খানিক দূরে চলে আসে। সিংহীদের পাঁচিলটা কোথাও কোথাও ভাঙা। একটা ভাঙা জায়গা পেয়ে সন্তু অনায়াসে পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোয়। কালু এসে গেছে কিনা দেখবার জন্য এধার-ওধার টর্চের আলো ফেলে। কোথাও কাউকে দেখা যায় না।

শিরীষ গাছের তলায় এসে সন্তু দাঁড়ায়। তুবার মুখে আঙুল পুরে সিটি বাজিয়ে অপেক্ষা করে। না, কালু এখনো আসে নি। বরং খবর পেয়ে মশারা আসতে শুরু করে ঝাঁক বেঁধে। হাঁটু, হাত, ঘাড় সব চুলকোনিতে জ্বালা ধরে যায়। সন্তু তু'চারটে চড়চাপড় মেরে বসে গা চুলকোয়। কালু এখনো আসছে না।

চারদিক ভয়ঙ্কর নির্জন আর নিস্তব্ধ। ঐ প্রকাণ্ড পুরনো আর ভাঙা বাড়িটায় সন্তু গুণ্ডাকে ফাঁসি দিয়েছিল। এই বাড়িতেই মরেছে সিংহবুড়ো। তার ওপর গতকাল দেখা লাশটার কথাও মনে পড়ে তার। ছেলেটার বয়স বেশী নয়, একটা বেশ ভাল জামা ছিল গায়ে, আর একটা ভাল প্যাণ্ট। ছেলেটার চুল লম্বা ছিল, বড় জুলপী আর

গোঁফ ছিল। ঐ রকম বড় চুল আর জুলপী রাখার সাধ সন্তুর খুব হয়। কিন্তু তার বাবা নানক চৌধুরী সন্তুকে মাসান্তে একবার পপুলার সেলুন ঘুরিয়ে আনে। সেখানকার চেনা নাপিত মাথা ক্রু-কাট করে দেয়।

সন্তুর যে ভয় করছিল তা নয়। তবে একটু ছমছমে ভাব। কি যেন একটা ঘটবে, কি যেন একটা হবে। ঠিক বুঝতে পারছে না সন্তু, তবে মনে হচ্ছে অলক্ষ্যে কে যেন একটা দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি আস্তে করে দো-বোমার পলতেয় ধরিয়ে দিচ্ছে। এখুনি জোর শব্দে একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হবে।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা শব্দ ওঠে। সন্তু শিউরে উঠল। অবিকল নীলমাধবের সেই সড়ালে কুকুরটা যেমন জঙ্গল ভেঙে ধেয়ে আসত ঠিক তেমন শব্দ। সন্তুর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। আকাশে মেঘ চেপে আছে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্তু কেবল প্যাণ্টের পকেট থেকে তার ছোট্ট ছুরিটা বের করে হাতে ধরে রইল। যেদিক থেকে শব্দটা আসছে সেদিকে মুখ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল সে। হাত-পা ঠাণ্ডা মেরে আসছে, বুক কাঁপছে, তবু খুব ভয় সন্তু পায় না। পালানোর চিন্তাও সে করে না।

একটু বাদেই সে ছোট্ট কেরোসিনের ল্যাম্পের আলো দেখতে পায়। রিকশার বাতি হাতে কালু আসছে। কিন্তু আসছে ঠিক বলা যায় না। কালু বাতিটা হাতে করে ভয়ঙ্কর টলতে টলতে এদিক-ওদিক পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ মাতাল।

সন্তু টর্চটা জ্বেলে বলে—কালু, এদিকে।

—কোন্ শালা রে! কালু চেঁচাল।

—আমি সন্তু।

—কোন্ সন্তু? বলে খুব খারাপ একটা খিস্তি দিল কালু।

সন্তু এগিয়ে গিয়ে কালুর হাত ধরে বলে—আস্তে। চেঁচালে লোক জেনে যাবে।

কালু বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলে—ওঃ, সন্তু !

—হ্যাঁ।

—আয়। বলে কালু তার হাত ধরে টানতে টানতে পোড়োবাড়ির বারান্দায় গিয়ে ওঠে। তারপর সটান মেঝেতে পড়ে গিয়ে বলে—আজ বেদম খেয়েছি মাইরি! নেশায় চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সন্তু পাশে বসে বলে—কি বলবি বলেছিলি ?

—কি বলব ? কালু ধমকে উঠে।

—বলেছিলি বলবি। সেই খুনের ব্যাপারটা !

—কোন খুন ? ফলির ?

হ্যাঁ।

কালু হা-হা করে হেসে বলে—আমি পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছি সন্তু, আর বলা যাবে না।

—কে দিল ?

—যে খুনী সে।

—লোকটা কে ?

কালু ঝড়াক করে উঠে বসে বলে—তোকে বলব কেন ?

—বলবি না ?

—না। পাঁচশো টাকা কি ইয়ার্কি মারতে নিয়েছি ?

সন্তু খুব হতাশ হয়ে বলল—তুই বলেছিলি বলবি।

কালু মাথা নেড়ে বলে—পাঁচশো নগদ টাকা পেয়ে আজ অ্যাতো মাল খেয়েছি। আরো অনেক আছে, পালবাজারে সব্জীর দোকান দেব, নয়তো লণ্ড্রী খুলব। দেখবি ?

বলে কালু তার জামার পকেট থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বের করে দেখায়। বলে—গোন্ তো, কত আছে। আমি বেহেড আছি এখন।

সন্তু গুনল। বাস্তবিক এখনো চারশো পঁচাশি টাকা আছে।

বলল—খুনী তোকে কিছু বলল না ?

—না। কী বলবে ! বলল—কাউকে বলবি না, তাহলে তোকেও শেষ করে ফেলব।

—পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল ?

কালু মাছি তাড়ানোর ভঙ্গী করে বলে—দূর, পাঁচশো টাকা আর কি ! এরকম আরো কত ঝেঁকে নেব। সবে তো শুরু।

সন্তু খুব উত্তেজিত হয়ে বলে—ব্ল্যাকমেল !

কালু চোখ ছোট করে বলে—আমি শালা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, আর তোমরা সব ভদ্রলোক, না ?

—ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার নয় রে। ব্ল্যাকমেল।

—আমি ইংরিজি জানি না ভেবেছিস ! রামগঙ্গা স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম, ভুলে যাস না।

সন্তু এতক্ষণে হাসল। বলল—ব্ল্যাকমেল হল···

—চুপ শালা ! ফের কথা বলেছিস কি···বলে কালু লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

সন্তু কালুর হঠাৎ রাগ কেন বুঝতে না পেরে এক পা পেছিয়ে তেজী ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে বলল—এর আগে খিস্তি করেছিস, কিছু বলি নি। ফের গরম খাবি তো মুশকিল হবে।

কালু তার বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলল—আহা চাঁদু ! গরম কে খাচ্ছে শুনি ? বলে ফের একটা নোংরা নর্দমার খিস্তি দেয়।

সন্তুর হাত-পা নিসপিস করে। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা টেনে বের করে আনে সে। বেশী বড় না হলেও, বোতাম টিপলে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি একটা ধারালো ফলা বেরিয়ে আসে। সন্তুর এখনো পর্যন্ত এটা কোন কাজে লাগে নি।

ফলাটা কেরোসিনের বাতিতেও লক-লক করে উঠল।

সন্তু বলল—দেব শালা ভরে !

—দিবি ? কালু উঠে দাঁড়িয়ে পেটের ওপর থেকে জামাটা তুলে বলল—দে না ! বলে জিব ভেঙিয়ে দু-হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে থাকে।

সন্তুর মাথাটা গোলমেলে লাগছিল। গতবার সে একটা গুণ্ডা বেড়ালকে ফাঁসী দিয়েছিল। শরীরের ভিতরটা আনচান করে ওঠে। সে একটা ঝটকায় কালুকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর উঠে বসে। তারপর সম্পূর্ণ অজান্তে ছুরিটা তোলে খুব উঁচুতে। তারপর বিদ্যুৎ-বেগে হাতটা নেমে আসতে থাকে।

কালু কি কৌশল করল কে জানে ! এক লহমায় সে শরীরের একটা মোচড় দিয়ে পাশ ফিরল। তারপর দুষ্টু ঘোড়া যেমন ঝাঁকি মেরে সওয়ারী ফেলে দেয় তেমনি সন্তুকে ঝেড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর। পাঁচ ইঞ্চি ফলাটা শানে লেগে ঠকাৎ করে পড়ে গেল।

কালু একটু দূরে গিয়ে ফের পড়ল। তারপর সব ভুলে ওয়াক্ তুলে বমি করল বারান্দা থেকে গলা বার করে।

বিস্মিত সন্তু বসে রইল হাঁ করে। সর্বনাশ ! আর একটু হলেই সে কালুকে খুন করত। ভেবেই ভয়ঙ্কর ভয় হল সন্তুর।

কালু বমি করে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসল বারান্দার থামে হেলান দিয়ে। মাথা লটপট করছে। অনেকক্ষণ দম নিয়ে পরে বলল—ছুরি চমকেছিস শালা, তুই মরবি।

সন্তু আস্তে করে বলে—তুই খিস্তি দিলি কেন ?

কালুর কেরোসিনের বাতিটা এখনো মেঝের ওপর জ্বলছে। সেই আলোতে দেখা গেল, কালু হাসছে। একটা হাই তুলে বলে—ওসব আমার মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে যায়। কিন্তু গাল দিলে কি গায়ে কারো ফোস্কা পড়ে ? আমাকেও তো কত লোকে রোজ দু'বেলা গাল দেয়। তা বলে গগনদার মত খুন করতে হবে নাকি !

সন্তু বিদ্যুৎ-স্পর্শে চমকে উঠল। গগনদা !

তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—তোকে টাকাটা কে দিয়েছে কালু ?

—বলব কেন ?

—আমি জানি। গগনদা।

—দূর বে !

—গগনদা খুন করেছে ?

কালু মুখটা বেঁকিয়ে বলে—কোন্ শালা বলেছে ?

—তুইই তো বললি।

—কখন ? নাঃ, আমি বলি নি।

সন্তু হেসে বলে—দাঁড়া, সবাইকে বলে দেব।

—কি বলবি ?

—গগনদা তোকে টাকা দিয়েছে। গগনদা খুনী।

কালু প্রকাণ্ড একটা ঢেঁকুর তুলে বুকটা চেপে ধরে বলে—টাকা ! হ্যাঁ, টাকা গগনদা দিয়েছে। তবে গগনদা খুন করে নি।

সন্তু হেসে টর্চটা নিয়ে পিছু ফিরল। ধীরে-সুস্থে পাঁচিলটা ডিঙিয়ে এল সে।

॥ পাঁচ ॥

অন্ধকার জিমনাসিয়ামে গগনচাঁদ বসে আছে। একা। অথর্বের মত।

কিছুক্ষণ সে মেঘচাপা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশের রঙ রক্তবর্ণ। কলকাতার আকাশে মেঘ থাকলে এরকমই দেখায় রাত্রিবেলা।

এখন রাত অনেক। বোধ হয় এগারোটা। কাল রাতে বৃষ্টির পর গ্যারাজঘরটা জলে থৈ-থৈ করছে। অন্তত ছয়-সাত ইঞ্চি জলে ডুবে আছে মেঝে। জলের ওপর ঘুরঘুরে পোকা ঘুরছে। কেঁচো আর শামুক বাইছে দেওয়ালে। ওরকম ঘরে থাকতে আজ ইচ্ছে করছে না। মনটাও ভাল নেই।

অন্ধকার জিমনাসিয়ামের চারধারে একবার তাকাল গগন। একটা মস্ত টিনের ঘর, চারধারে বেড়া। হাতের টর্চটা একবার জ্বালল। সিলিং থেকে রিং ঝুলছে, অদূরে প্যারালাল বার, টানবার স্প্রিং, রোমান রিং, স্প্যান্টিং বোর্ড কত কি! একজন দারোয়ান পাহারা দেয় দামী যন্ত্রপাতি। একটু আগে দারোয়ান এসে ঘুরে দেখে গেছে। মাস্টারজি মাঝে মাঝে এরকম রাতে এসে বসে থাকে, দারোয়ান তা জানে। তাই গগনকে দেখে অবাক হয় নি। জিমনাসিয়ামের ছোট্ট উঠোনটার শেষে দারোয়ানের খুপরিতে একটু আগেও আলো জ্বলছিল। এখন সব অন্ধকার হয়ে গেছে। গগনের কাছে চাবি আছে, যাওয়ার সময়ে বন্ধ করে যাবে। কিন্তু ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না গগনের। পচা জল, নর্দমার গন্ধ, পোকামাকড়। তবু থাকতে হয়। গ্যারাজ-ঘরটার ভাড়া মোটে ত্রিশ টাকা, ইলেকট্রিকের জন্য আলাদা দিতে হয় না, তবে একটা মাত্র পয়েণ্ট ছাড়া অন্য কিছু নেই। গগনের রোজগার এমন কিছু বেশী নয় যে লাটসাহেবী করবে। এ অঞ্চলে বাড়ি-ভাড়া এখন আগুন। একটা মাত্র ঘর ভাড়া করতে কতবার চেষ্টা করেছে গগন, একশোর নীচে কেউ কথা বলে না। অবশ্য এ কথাও ঠিক, গগন একটু স্থিতু মানুষ, বেশী নড়াচড়া পছন্দ করে না। গ্যারাজঘরটায় তার মন বসে গেছে। অন্য জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করলে তার মন খারাপ হয়ে যায়। গ্যারাজঘরটায় বেশ আছে সে। শোভারাণী বকাবকি করে, ভাড়াটেদের ক্যাচ ক্যাচ আছে, জলের অসুবিধে আছে, তবু খুব খারাপ লাগে না। কেবল বর্ষাকালটা বড্ড জ্বালায় এসে। তবু বর্ষা-বৃষ্টি হোক, নাইলে মুরাগাছার জমি বুক ফাটিয়ে ফসল বের করে দেবে না। মানুষের এই এক বিপদ, বর্ষা বৃষ্টি গরম শীত সবই তাকে নিতে হয়, সব কিছুই তার কোন না কোন ভাবে প্রয়োজন। কাউকেই ফেলা যায় না। এই যে এ অঞ্চলে এত মশা, গগন জানে এবং বিশ্বাসও করে যে, এই সব মশার উৎপত্তি এমনি এমনি হয় নি। হয়তো এদেরও প্রকৃতির প্রয়োজন আছে। এই যে সাপখোপ,

বোলতা-বিছে, বাঘ-ভালুক—ভাল করে দেখলে বুঝি দেখা যাবে যে এদের কেউ ফেলনা নয়। সকলেই যে যার মত এই জগতের কাজে লাগে।

গগন উঠে জিমনাসিয়ামের ভিতরে এল। মস্ত মস্ত গোটাকয় আয়না টাঙানো দেয়ালে। অন্ধকারেও সেগুলো একটু চকচক করে ওঠে। গগন টর্চ জ্বেলে আয়না দেখে। গত চার-পাঁচ বছরে এসব আয়না তার কত চেলার প্রতিবিম্ব দেখিয়েছে। কোথায় চলে গেছে সব! আয়না কারো প্রতিচ্ছবি ধরে রাখে না। এই পৃথিবীর মতই তা নির্মম এবং নিরপেক্ষ। টর্চ জ্বেলে গগন চারদিক দেখে। ঐ রিং ধরে একদা ঝুল খেয়ে গ্রেট সার্কেল তৈরী করেছে ফলি। বুকে মস্ত চাঁই পাথর তুলছে। বীম ব্যালান্স্ আর প্যারালাল বার-এ চমৎকার কাজ করত ছেলেটা। শরীর তৈরী করে সাজানো শরীরের প্রদর্শনী গগনের তেমন ভাল লাগে না। বরং সে চায় ভাল জিমন্যাস্ট তৈরী করতে, কি মুষ্টিযোদ্ধা, কি যুডো খেলোয়াড়। সে-সব দিকে ফলি ছিল অসাধারণ। যেমন শরীর সাজানো ছিল থরে-বিথরে মাংস-পেশীতে, তেমনি জিমন্যাস্টিক্সেও সে ছিল পাকা! ফলিকে কিছুকাল যুডো আর বক্সিংও শিখিয়েছিল গগন। টপাটপ শিখে ফেলত। সেই ফলি কোথায় চলে গেল!

ভূতের মত একা একা গগন জিমন্যাসিয়ামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে এধার ওধার দেখে। মেঝেয় বারবেলের চাকা পড়ে আছে কয়েকটা। পায়ের ডগা দিয়ে একটা চাকা ঠং করে উল্টে ফেলল সে। এক হাতে রিং ধরে একটু ঝুল খেল। প্যারালাল বার-এ উঠে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভাল লাগছে না। মনটা আজ ভাল নেই। ফলিকে কে মারল? কেন ফলি ওসব নেশার ব্যবসা করতে গেল?

আজ সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে গ্যারাজঘরে বসে সে অনেকক্ষণ উৎকর্ণ থেকেছে। না, শোভারাণীদের ঘর থেকে তেমন কোন সন্দেহজনক

শব্দ হয় নি। রাত ন'টায় নরেশও ফিরে এল। স্বাভাবিক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল ওপর থেকে। তার মানে ওরা এখানো ফলির মৃত্যুসংবাদ পায় নি। বড় আশ্চর্য কথা! ফলিকে এখানে সবাই এক সময়ে চিনত। তবু তার মৃতদেহ কেন কেউ সনাক্ত করতে পারে নি? কেবলমাত্র পুলিস আর কালু ছাড়া! তাও পুলিস বলেছে—ফলি অ্যাব্‌স্‌কণ্ডার। ফলি ফেরারই বা ছিল কেন?

মাথাটা বড্ড গরম হয়ে ওঠে।

গগনচাঁদের বুদ্ধি খুব তৎপর নয়। খুব দ্রুত ভাবনা-চিন্তা করা তার আসে না। সব সময়ে সে ধীরে চিন্তা করে। কিন্তু যা সে ভাবে তা সব সময়ে একটা নির্দিষ্ট যুক্তি-তর্ক এবং গ্রহণ-বর্জনের পথ ধরে চলে। হুটহাট কিছু ভাবা তার আসে না। গগন বহুকাল ধরে নিরামিষ খায়। সম্ভবতঃ নিরামিষ খেলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কিছু ধীর হয়ে যায়। নিরামিষ খাওয়ার পিছনে আবার গগনের একটা ভাবপ্রবণতাও আছে। ছটফটে জ্যান্ত জীব, জালে বদ্ধ বাঁচার আকুলতা নিয়ে মরে যাওয়া মাছ কিংবা ডিমের মধ্যে অসহায় ভ্রূণ এদের খেতে তারা বড় মায়া হয়। আরো একটা কারণ হল, আমিষ খেলে মানুষের শরীরের স্বয়ং-উৎপন্ন বিষ টকসিন খুব বেড়ে যায়। টকসিন বাড়লে শরীরে কোন রোগ হলে তা বড় বেশী জখম করে দিয়ে যায় শরীরকে। কেউ কেউ গগনকে বলেছে— নিরামিষভোজীরা খুব ধীরগতিসম্পন্ন, পেটমোটা। গগন তার উত্তরে তৃণভোজী হরিণ বা ঘোড়ার উল্লেখ করেছে, যারা ভীষণ জোরে ছোটে। তাদের পেটও মোটা নয়। নিরামিষ খেয়ে গগনের তাগদ কারো চেয়ে কম নয়। গতিবেগ এখনো বিদ্যুতের মত। যুডো বা বক্সিং শিখতে আসে যারা তারা জানে গগন কত বড় শিক্ষক। তাও গগন খায় কি? প্রায়দিনই আধসেরটাক ডাল আর সব্জী-সেদ্ধ, কিছু কাঁচা সব্জী, দুচারটে পেয়ারা বা সময়কালে কমলালেবু বা আম, আধসের দুধ, সয়াবীন, কয়েকদানা ছোলা-বাদাম। তাও বড় বেশী

নয়। শরীর আন্দাজে গগনের খাওয়া খুবই কম। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোনদিনই সে বেশী মাথা ঘামায় না। এই সব মিলিয়ে গগন। ধীরবুদ্ধি, শান্ত, অনুত্তেজিত, কোন নেশাই তার নেই।

মেয়েমানুষের দোষ নেই, তবে আকর্ষণ থাকতে পারে।

যেমন বেগম। ফলি যখন গগনের কাছে কসরৎ করা শিখত, তখন বহুবার বেগম এসেছে জিমন্যাসিয়ামে। সে বেড়াতে আসত বোনের বাড়ি, সেই তক্কে জিমন্যাসিয়ামে ছেলেকে দেখে যেত। তখন ব্যায়ামাগারটাই ছিল বলতে গেলে ফলির বাসস্থান।

গগনের আজও সন্দেহ হয়, শুধু ছেলেকে দেখতেই আসত কিনা বেগম। বরং ছেলেকে দেখার চেয়ে ঢের বেশী চেয়ে দেখত গগনকে। তার তাকানো ছিল কি ভয়ঙ্কর মাদকতায় মাখানো। বড় বড় চোখ, পটে-আঁকা চেহারা, গায়ের রঙ সত্যিকারের রাঙা। রোগা নয়, আবার কোথাও বাড়তি মাংস নেই। কি চমৎকার ফিগার! প্রথমটায় গগনের সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু গগন বিভিন্ন ব্যায়ামকারীর কাছে ঘুরে ঘুরে নানা জিনিস শেখাচ্ছে, স্যাণ্ডো গেঞ্জি আর চাপা প্যাণ্ট পরা তার বিশাল দেহখানা নানা বিভঙ্গে বেঁকছে, দুলছে বা ওজন তুলবার সময় থামের মত দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে—এ সবই বেগম অপলক চোখে দেখেছে। বেগমের বয়স বোঝে কার সাধ্য! তাকে ফলির মা বলে মনে হত না, বরং বছর দু'তিনের বড় বোন বলে মনে হত। ফলি একদিন বলেছিল—মা চমৎকার সব ব্যায়াম জানে, জানেন গগনদা! এখনো রোজ আসন করে।

বেগম প্রথমে ভাববাচ্যে কথা বলত। সরাসরি নয়, অথচ যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বলার মত করে বলত—কতদিন এখানে চাকরি করা হচ্ছে? কিংবা জিজ্ঞেস করত—জামাইবাবুর সঙ্গে কারো বুঝি খুব খটাখটি চলছে আজকাল? পরের দিকে বেগম সরাসরি কথা বলত। যেমন একদিন বলল—আপনার বয়স কত বলুন তো?

বিনীত ভাবে গগন জবাব দিল—উনতিরিশ।

—একদম বোঝা যায় না। বিয়ে করেছেন ?

—না।

—কেন ?

গগন হেসে বলে—খাওয়াব কি ? আমারই পেট চলে না।

—অত যার গুণ তার খাওয়ার অভাব !

—তাই তো দেখছি।

—আপনি ম্যাসাজ করতে জানেন ?

—জানি।

—তাহলে আপনাকে কাজ দিতে পারি। করবেন ?

গগন উদাসভাবে বলল—করতে পারি।

—একটা অ্যাথলেটিক ক্লাব আছে, ফুটবল ক্লাব, খেলোয়াড়দের ম্যাসাজ করতে হবে। ওরা ভাল মাইনে দেয়।

গগন তখন বলল—আমার সময় কোথায় ?

খুব হেসে বেগম বলল—তাহলে করবেন বললেন কেন ? ঐ ক্লাবে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে। হোলটাইম জব। সময়ের অভাব হবে না। আর যদি ছুটকো-ছাটকা ম্যাসাজ করতে চান, পক্ষাঘাতের রুগী-টুগী, তাও দিতে পারি।

গগন বলল—ভেবে দেখব !

আসলে গগন ওসব করতে চায় না, সে চায় ছাত্র তৈরী করতে। ভাল শরীরবিদ, জিমন্যাস্ট, বক্সার, যুডো-বিশেষজ্ঞ। সে খেলোয়াড়-দের পা বা রুগীর গা ম্যাসাজ করতে যাবে কেন ?

কিন্তু ঐ যে সে ম্যাসাজ জানে ওটাই তার কাল হয়েছিল। কারণ একবার বেগম নাকি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকায়। খবর এল, ম্যাসাজ দরকার। প্রথমে গগন যায়নি। সে কিছু আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বেগম ছাড়বে কেন ? খবরের পর খবর পাঠাত। বিরক্ত হয়ে একদিন বাপুজি কলোনীর বাড়িতে যেতে হয়েছিল গগনকে।

বেগমের পা ধরেই সে বুঝতে পেরেছিল, কিছু হয়নি। বেগমও হেসে বলেছিল—খুব ব্যথা, বুঝলেন!

গগন পা-খানা নেড়ে-চেড়ে বলল—কোথায়?

বেগম বলল—সব ব্যথা কি শরীরে? মন বলে কিছু নেই?

তারপর কি হয়েছিল তা আর গগন মনে করতে চায় না। তবে এটুকু বলা যায়, গগনের মেয়েমানুষে আকর্ষণ আছে, লোভ না থাক। বেগমের বেলা সেটুকু বোঝা গিয়েছিল। বলতে গেলে, তার জীবনের প্রথম মেয়েমানুষ ঐ বেগম। কিছুকাল খুব ভালবেসেছিল বেগম তাকে। তারপর যা হয়। ওসব মেয়েদের একজনকে নিয়ে থাকলে চলে না! গগন তো তার ব্যবসার কাজে আসত না। বেগম তাই অন্য সব মানুষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর বেগমের দেহের সুন্দর ও ভয়ঙ্কর স্মৃতি নিয়ে গগন সরে এল একদিন।

আয়নায় কোন প্রতিচ্ছবি থাকে না। পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে, সব মুছে যায়। অবিকল আয়নার মত।

ফলির কথাই ভাবছিল গগন। ফলি বেঁচে নেই। তার খুব প্রিয় ছাত্র ছিল ফলি। মানুষ হিসেবে ফলি হয়তো ভাল ছিল না, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ছাত্র হিসেবে ফলি ছিল উৎকৃষ্ট। ও-রকম চেলা গগন আর পায়নি।

অন্ধকার জিমন্যাসিয়ামে প্যারালাল বার-এর ওপর বসে গগনের দু চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল নেমে এল। বিড়-বিড় করে কি একটু বলল গগন। বোধ হয় বলল—দূর শালা! জীবনটাই অদ্ভুত!

অনেক রাতে গগন যখন গ্যারাজঘরে ফিরল তখন সে খুব অন্য-মনস্ক ছিল। নইলে সে লক্ষ্য করত, এত রাতেও পাড়ার রাস্তায় কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে কি যেন আলোচনা করছে। আশপাশের বাড়িগুলোয় আলোও জ্বলছে।

গগন যখন তালা খুলছে তখন একবার টের পেল এ-বাড়ি সে-বাড়ির জানালায় কারা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখল তাকে। নরেশ

মজুমদারের ঘরে স্টিক-লাইট জ্বলছে। এত রাতে ওরকম হওয়ার কথা নয়। রাত প্রায় বারোটা বাজে। এ-সময় সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোয়। কেবল অদূরে একটা বাড়ির দোতলায় নানক চৌধুরীর ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে।

গগন ঘরে এসে প্রায় কিছুই খেল না। ঠাণ্ডা দুধটা চুমুক দিয়ে শুয়ে রইল। বাতি নেভাল না। ঘরে জল খেলছে, কোন পোকা-মাকড় রাতবিরেতে বিছানায় উঠে আসে। বর্ষাকালে প্রায় সময়েই সে বাতি জ্বেলে ঘুমোয়। নরেশ মজুমদারের মিটার উঠুক, তার কি ?

ঘুম না এলে গগনচাঁদ জেগে থাকে। চোখ বুজে মটকা মারা তার স্বভাব নয়। আজও ঘুম এল না, তাই চেয়ে থেকে কত কথা ভাবছিল গগন। ভিতরদিকে গ্যারাজঘরের ছাদের সঙ্গে লাগানো, উঁচুতে একটা চারফুট দরজা আছে। ঐ দরজাটা সে আসবার পর থেকে বরাবর বন্ধ দেখেছে। সম্ভবতঃ কোনদিন ঐ দরজা দিয়ে সহজে গ্যারাজে ঢোকা যাবে বলে ওটা করা হয়েছিল। বৃষ্টি-বাদলার দিনে ঘর থেকে নরেশ তার বৌ নিয়ে সরাসরি গ্যারাজে আসতে পারত। এখন গ্যারাজে গাড়ি নেই, গগন আছে। তাই দরজাটা কড়াক্কড় করে বন্ধ। প্রায় সময়েই গগন দরজাটা দেখে। হয়তো কখনো ঐ দরজা থেকে নেমে আসবার কাঠের সিঁড়ি ছিল। আজ তা নেই। গুপ্ত সুড়ঙ্গের মত দরজাটাই আছে কেবল। রহস্যময়।

আশ্চর্য এই, আজ দরজাটার দিকে তাকিয়ে গগন দরজাটার কথাই ভাবছিল। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ খুব পুরনো একটা ছিটকিনি খোলার কষ্টকর শব্দ হল। তারপরই কে যেন হুড়কো খুলছে বলে মনে হল। সিলিংয়ের দরজাটা বার দুই কেঁপে উঠল।

ভয়ঙ্কর চমকে গেল গগনচাঁদ। বহুকাল এমন চমকায়নি। সে শোয়া অবস্থা থেকে ঝট্ করে উঠে বসল। প্রবল বিস্ময়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

তাকে আরো ভয়ঙ্কর চমকে দিয়ে দরজার পাল্লাটা আস্তে খুলে

গেল। আর চারফুট সেই দরজার ফ্রেমে দেখা গেল, শোভারাণী একটা পাঁচ ব্যাটারীর মস্ত টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

গগন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবাক চোখে চেয়ে ছিল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। চোখ বড়।

শোভারাণী সামান্য হাঁফাচ্ছিল। বেগমের বোন বলে ওকে একদম মনে হয় না। শোভা কালো, মোটা, বেঁটে। মুখশ্রী হয়তো কোনদিন কমনীয় ছিল, এখন পুরু চর্বিতে সব গোল হয়ে গেছে।

শোভারাণী ঝুঁকে বলল—এই এলেন ?

—হুঁ। বলে বটে গগন, কিন্তু সে ধাতস্থ হয়নি।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?

—বাইরে। ঘোরের মধ্যে উত্তর দেয় গগন। ওরা কি তবে ফলির খবরটা পেয়েছে! তাই হবে। নইলে এত রাতে গুপ্ত দরজা দিয়ে শোভা আসত না। শোভারাণীর মুখে অবশ্য কোন শোকের চিহ্ন নেই। বরং একটা উদ্বেগ ও আকুলতার ভাব আছে।

শোভা বলল—লাইনের ধারে যে মারা গেছে কাল সেটাকে জানেন ?

—জানি। একটু ইতস্তত করে গগন বলে।

—সবাই বলছে ফলি। সত্যি নাকি ?

লুকিয়ে লাভ নেই। বার্তা পৌঁছে গেছে। গগন তাই মাথা নাড়ল। তারপর কপালে হাত দিল একটু।

—ফলিকে কে দেখেছে ?

গগন বলল—পুলিস দেখেছে। আর রিক্সাওলা কালু।

—ঠিক দেখেছে ? তীব্র চোখে চেয়ে শোভা জিজ্ঞেস করে।

—তাই তো বলছে। গগন ফের কপালে হাত দেয়।

শোভারাণী ঠোঁট উল্টে বলল—আপদ গেছে।

বলেই ঘরে আলো থাকা সত্ত্বেও টর্চটা জ্বেলে আলো ফেলল মেঝেয়। বলল—ঘরে জল ঢোকে দেখছি।

—বর্ষাকালে ঢোকে রোজ। গগন যান্ত্রিক উত্তর দেয়।

—বলেননি তো কখনো!

গগন আস্তে করে বলে—বলার কি! সবাই জানে।

শোভা মাথা নেড়ে বলে—আমি জানতাম না।

গগন উত্তর দেয় না। শোভার কাছে এত ভদ্র ব্যবহার পেয়ে সে ভীষণ ভালমানুষ হয়ে যাচ্ছিল।

শোভা টর্চটা নিভিয়ে বলল—শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

গগন উঠে বসে উর্ধ্বমুখে যেন কোন স্বর্গীয় দেবীর কথা শুনছে, এমন ভাবে উৎকর্ণ হয়ে ভক্তিভরে বসে থাকে। বলে—বলুন।

—কালু একটা গুজব ছড়িয়েছে।

—কি?

—ফলিকে যে খুন করেছে তাকে নাকি ও দেখেছে।

গগন মাথা নেড়ে বলল—জানি।

—কি জানেন?

—কালু ওকথা আমাকেও বলেছে।

—কে খুন করেছে তা বলেনি? শোভা ঝুঁকে খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে।

গগন মাথা নাড়ে—না। ও পাঁচশো টাকা দাবী করবে খুনীর কাছে। বলবে না।

শোভা হেসে বলে—সেই পাঁচশো টাকা কালু পেয়ে গেছে।

শোভারাণীর হাসি এবং শোকের অভাব দেখে গগন খুব অবাক হয়। ফলির মৃত্যুতে কি শোভার কিছু যায়-আসেনি! বোনপোটা মরে গেল, তবু ও কি রকম যেন স্বাভাবিক!

গগন ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল—কার কাছে পেয়েছে?

শোভা অদ্ভুত একটু হেসে বলল—ও বলছে, টাকা নাকি ওকে আপনি দিয়েছেন!

—আমি! আমি টাকা দিয়েছি! খুব আস্তে গগনের বুদ্ধি কাজ করে। প্রথমটায় সে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কি। ভেবে ভেবে জোড়া দিতে লাগল। তাতে সময় গেল খানিক।

শোভা বলল—একটু আগে কালুকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে।

গগন তেমনি দেবী-দর্শনের মত উর্ধ্বমুখ হয়ে নীরব থাকে। বুঝতে সময় লাগে তার। তারপর হঠাৎ বলে—আমি ওকে টাকা দিইনি।

শোভা ঠোঁট ওল্টাল। বলল—ও তো বলছে!

—আর কি বলছে?

শোভা হেসে বলে—খুনীর নামটাও বলেছে।

—কে? বলেই গগন বুঝতে পারে তার গলার স্বর তার নিজের ফাঁকা মাথার মধ্যে একটা প্রতিধ্বনি তুলল—কে!

শোভা তীব্র চোখে চেয়ে থেকে বলল—ও আপনার নাম বলছে।

—আমি! আমার নাম! বলে গগন মাথায় হাত দিয়ে বলে —না তো! ও মিথ্যে কথা বলছে।

শোভা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বলল—কালু মদ-গাঁজা খায়। ওর কথা কে বিশ্বাস করে, আহাম্মক ছাড়া! তবে ফলিকে কেউ খুন করে থাকলেও অন্যায় করেনি। আমি তো সেজন্য জোড়াপাঁঠা মানসিক করে রেখেছি।

গগন উত্তর দিতে পারে না। মাথাটা ফাঁকা লাগছে। সে শু শোভার দিকে চেয়ে থাকে।

শোভা বলে—শুনুন। যদি ফলিকে কেউ মেরে থাকে তো দুঃখের কিছু নেই। আমার স্বামী কাঁদছেন। তাঁর বোধ হয় কাঁদবার কথা। তিনি ঠিক করেছিলেন, আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সব নামে লিখে দেবেন। উইল নাকি করেও ছিলেন। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনি। ফলির জন্ম ভাল নয়।

গগন উত্তর দিতে পারছিল না। তবু মাথা নাড়ল।

শোভা বলল—আপনি বা যে কেউ ওকে খুন করে থাকলে ভাল কাজই হয়েছে। পেস্তা নামে যে বাচ্চা মেয়েটা অন্তঃস্বত্বা হয়েছিল, সে এখনো আমার কাছে আসে। তার বোধ হয় আর বিয়ে হবে না। ফলির গুণকীর্তির কথা কে না জানে! তবু আমার স্বামীকে কিছু বোঝানো যাবে না। তিনি সম্ভবত পুলিস ডেকে আজ রাতেই আপনাকে গ্রেফতার করাবেন।

—আমাকে!

শোভা সামান্য উষ্মার সঙ্গে বলে—ওরকম ভ্যাবলার মত করছেন কেন? এ সময়ে বুদ্ধি ঠিক না রাখলে ঝামেলায় পড়বেন।

গগন হঠাৎ বলল—কি করব?

শোভা বলে—কি আর করবেন, পালাবেন।

গগন দিশাহারার মত বলল—পালাব কেন?

—সেটা বুঝতে আপনার সময় লাগবে। শরীরটাই বড়, বুদ্ধি ভীষণ কম। পুলিসে ধরলে আটক রাখবে, মামলা হবে, সে অনেক ব্যাপার। বরং পালিয়ে গেলে ভাববার সময় পাবেন।

—কোথায় পালাব?

—সেটা যেতে যেতে ভাববেন। এখন খুব বেশী সময় নেই। এইখান দিয়ে উঠে আসতে পারবেন?

গগন হাসল এবার। সে শরীরের কসরতে ওস্তাদ লোক। গ্যারাজঘরের ছাদের দরজায় ওঠা তার কাছে কোন ব্যাপার নয়। মাথা নেড়ে বলল—খুব।

—তাহলে বাতিটা নিভিয়ে উঠে আসুন। এখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভাল রাস্তা আছে। কেউ দেখবে না। দেয়াল টপকে ওদিকে এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনের কারখানার মাঠ দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠবেন। দেরি করবেন না। উঠে আসুন।

গগন বাতি নিভিয়ে দেয়। শোভা টর্চ জ্বেলে রাখে। গগন পোশাক পরে নেয়। দুটো একটা টুকিটাকি দরকারী জিনিস ভরে

নেয় ঝোলা ব্যাগে। তারপর হাতের ভর দিয়ে দরজায় উঠে পড়ে।

শোভা টর্চ জ্বেলে আগে আগে পথ দেখিয়ে দেয়। মেথরের আসবার রাস্তায় এলে শোভারাণী তাকে বলে—এই রাস্তা দিয়ে চলে যান। টাকা লাগবে?

গগন মাথা নাড়ে—না।

শোভা হেসে বলে—লাগবে। সন্থ সন্থ পাঁচশো টাকা বেরিয়ে গেছে, এখন তো হাত খালি!

গগন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে তাকায়।

আর শোভারাণী সেই মুহূর্তে তাকে প্রথম স্পর্শ করে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার প্যাণ্টের পকেটে বোধ হয় কিছু টাকাই গুঁজে দেয়। খুব নরম স্বরে বলে—বেগম খারাপ! আমি খারাপ নই। আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি খুন করেছেন। এখন যান। গ্যারাজ-ঘরের ভিতরটা আমি উঁচু করে দেব। সময়মত ফিরে এসে দেখবেন ঘরটা অনেক ভাল হয়ে গেছে। আর জিনিসপত্র যা রইল তা আমি দেখে রাখব। এখন আসুন তো!

গগন মাথা নাড়ে। তারপর আস্তে করে গিয়ে এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনের পাঁচিল টপকায়। মাঠ পেরোয়।

কয়েকটা টর্চবাতি ইতস্তত কাকে যেন খুঁজছে। গগন মাথা নীচু করে এগোয়। একটা বড় গাড়ি এসে থামল কাছেই কোথাও। গগন বাদবাকি পথটুকু দৌড়ে পার হয়ে যায়। ফের পাঁচিল টপকে বড়-রাস্তায় পড়ে।

রাতের ফাঁকা রাস্তা। কোথাও কোন যানবাহন নেই। কেবল একটা ট্যাক্সি সওয়ারী খালাস করে ধীরে ফিরে যাচ্ছে। গগন হাত তুলে সেটাকে থামায়। সচরাচর সে ট্যাক্সিতে চড়ে না। পয়সার জন্যও বটে, তাছাড়া বাবুয়ানী তার সয় না। আজ উঠে বসল। কারণ অবস্থাটা আজ গুরুচরণ। তাছাড়া শোভারাণীর দেওয়া বেশ কিছু টাকাও আছে পকেটে।

পৃথিবীটাকে ঠিক বুঝতে পারে না গগনচাঁদ। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মেঘলা করে আসে। গ্যারাজঘরে জল ওঠে আধ-হাঁটু। জীবনটা এরকমই। মাঝে মাঝে বিনা কারণে এরকম পালাতে হয়।

অবস্থাটা এখনো ঠিক বুঝতে পারে না গগন। তবু সেজন্য তার চিন্তা হয় না। এখন সে শোভারাণীর কথা ভাবে। ভাবতে বেশ ভাল লাগছে তার।

॥ ছয় ॥

কালুকে পুলিস তেমন কিছু করেনি। দু-চারটে ঠোকনা যে না মেরেছে তা নয়, কিন্তু সে বলতে গেলে সিপাইদের আদর। পুলিসের আসল ধোলাই কেমন তা খানিকটা কালু জানে।

পুলিসের কাছে কালু কারো নাম বলেনি।

থানার বড়বাবু তাকে জিজ্ঞেস করল—তুই ফলিকে খুন হতে দেখেছিস?

কালু দম ধরে রেখে খানিক ভাবল। ভেবে দেখল, সে অনেককেই ঘটনাটা বলছে, তাই এখানে মিছে কথা বললে নাহোক ধোলাই হবে। আর পুলিস যদি মারে তো কোনো শালার কিছু করার নেই। তাই সে চোখ পিটপিট করে বড়বাবুর কোঁতকা চেহারাটা চোখভরে দেখতে দেখতে বলল—দেখেছি।

—সত্যি দেখেছিস, না কি নেশার ঘোরে বানিয়েছিস?

কালুর সেই তেজ আর নেই, যেমনটা সে সুরেন খাঁড়া, গগন আর সন্তুকে দেখিয়েছিল। পুলিসের সামনে কারই বা তেজ থাকে?

কালু মেঝেয় উবু হয়ে বসা অবস্থায় মাথা চুলকে বলল—নেশাও ছিল, তবে আবছা দেখেছি।

বড়বাবুর বুটসুদ্ধু মোটা একখানা পা তার কাঁকালে এসে লাগল

এসময়ে। খুব জোরে নয়, তবে কালু তাতেই টাল্লা খেয়ে হড়াৎ করে পড়ে গেল। একদাঁত হেসে সে আবার উঠে বসে।

বড়বাবুর মুখে হাসি নেই, ভ্রূ কুঁচকে বলে—ঠিকসে বল।

—অন্ধকার ছিল যে।

—সেখানে তুই কী করছিলি?

—সাঁঝ বাজারে একটা লোক তাড়ি আনে। রোজ যেয়ে তার কাছে বসি।

বড়বাবু পা ফের তুলে বলে—এটুকু বয়সেই মালের পাকা খদ্দর!

—খাই মাঝে মাঝে, তাকৎ পাই না নাহলে।

এবারের লাথিটা আরো আস্তে এল। লাগল না তেমন।

বড়বাবু বলে—ঠিক করে বল কী করছিলি!

—বড় একটা ভাঁড় নিয়ে লাইনের ধারে বসে খাচ্ছিলাম। এসময় কতগুলো ছেলে এল লাইনের ওধারে। কী সব বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে।

—কিছু শুনতে পাসনি?

—না, খুব আস্তে বলছিল।

—ঝগড়া কাজিয়া বলে মনে হয়েছিল?

—না। আপসে যেমন কথা হয় দোস্তদের মধ্যে।

—তারপর?

—ওরা আমাকে দেখেনি, জায়গাটা অন্ধকার।

—ক'জন ছিল?

—চার-পাঁচজন হবে। তাদের একজন খুব লম্বাচওড়া।

—অন্ধকারে বুঝলি কী করে?

—বললাম তো আবছা দেখা যাচ্ছিল।

—লম্বাচওড়া লোকটা কে? গগন?

—কী জানি!

—তবে লোককে বলছিস কেন যে গগনবাবু লাশ নামিয়েছে ?

কালু অবাক হয়ে বলে—কখন বললাম ?

—বলিসনি ? বড়বাবু চোখ পাকিয়ে বলে।

—মাইরি না।

এ সময়ে একটা সিপাই পাশ থেকে ঠোকনা মারে। খুব জোরে নয়, তবে তাতে কালুর ডান গালের চামড়া থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে গেল, আর কষের একটা দাঁতের গোড়া বুঝি নাড়া খেয়ে আরো খানিক রক্ত চলকে দিল। মুখের রক্ত ঢোঁক গিলে পেটে চালান দিয়েছিল কালু। থানায় ধরে আনার পর থেকে দাঁতে কুটো পড়েনি। পেট জ্বলছে।

বড়বাবু বলে—সব ঠিকঠাক করে বল!

কালু হাসবার চেষ্টা করে বলে—বলছি তো বড়বাবু, গগনদার কথা কাউকে বলিনি।

—খুনটা কেমন করে হল ?

—সে খুব সাঙ্ঘাতিক। হঠাৎ দেখি সেই চার-পাঁচজনের মধ্যে একজনকে সেই জোয়ান লোকটা পিছন থেকে কী দিয়ে যেন মাথায় মারল।

—জোরে মারল ?

—তেমন জোরে নয়, তবে ছেলেটা পড়ে গেল মাটিতে।

—তারপর ?

—তারপর একটা তোয়ালে বা কাপড় কিছু একটা দিয়ে ছেলেটার গলা পেঁচিয়ে সেই জোয়ান লোকটা খুব চেপে ধরল।

—কতক্ষণ ?

—খুব বেশীক্ষণ নয়, ভয়ে আমি শব্দ করিনি।

—তারপর কী হল ?

—লোকগুলো চলে গেল।

—তুই খুনীকে চিনতে পারিসনি ?

—মাইরি না।

—তবে তোকে টাকা দিল কে?

—টাকা! কালু খুব অবাক হয়।

—তোকে নাকি খুনী পাঁচশ টাকা দিয়েছে?

—মাইরি না বড়বাবু—

কালু পা ধরতে যাচ্ছিল, এ সময়ে আর একটা বেতাল ঠোকনা খেয়ে পড়ে যায়। মাথার পিছনে বাঁ ধারে মুহূর্তের মধ্যে একটা আলু ফুটে উঠল। ঝাঁ-ঝাঁ করছিল ব্যথায়।

—টাকা পাসনি?

কালু দাঁতে দাঁত চেপে ভাবছিল কোন্ শালা কথাটা ফাঁস করেছে! সন্তু জানে, আর রিকসাওয়ালা নিতাই তার দোস্ত—সে জানে। আর সুরেন, গগন এরকম দু'চারজনকে সে মুখে বলেছিল বটে যে টাকা পেলে খুনীর নাম বলবে। এদের মধ্যেই কেউ ব্যাপারটা ফাঁস করেছে। কালুর সন্দেহ সন্তুকে। ওরকম হাড়বজ্জাত ছেলে হয় না।

—না। কালু চোখের জল মুছে বলে। পুলিস অবশ্য তাকে ধরে এনে প্রায় উদোম করে সার্চ করেছে। টাকা পায়নি।

মারধর কালুর যে খুব লাগে তা নয়। কিন্তু এটা ঠিক তাকে কেউ গমের বস্তা মনে করলে তার মাথায় খুন চেপে যায়। কিন্তু পুলিসের সঙ্গে হুজ্জুত করার মুরোদ কারই বা থাকে?

বড়বাবু বললেন—ত্থাখ ত্যাঁদড়ামি করিস না, করলে মেরে পাট করে দেবো। আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু রোজ এসে হাজিরা দিয়ে যাবি। সত্যি মিথ্যে কী কী বলেছিস তার সব আমরা টের পেয়ে যাবো। এটা সত্যিই খুনের মামলা কিনা, নাকি তুই ব্যাপারটা ঘুলিয়ে তুলেছিস, এসব জানতে আমাদের বাকি থাকবে না। যদি শালা আমাদের ঘোল খাওয়ানোর চেষ্টা করে থাকো তবে জন্মের মতো খতম হয়ে যাবে।

কালুকে এরপর প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

কালু অবশ্য তাতে কিছু মনে করেনি। সে জানে সে একটা রিক্সাওয়ালা মাত্র। কাজটা এতই ছোট যে তুনিয়ার কারো কাছে কিছু আশা করা যায় না। ইস্কুলের নীচু ক্লাসে পড়বার সময়েই সে কেন যেন টের পেত যে তার জীবনটা খুব সুখের হবে না। গড়ফায় তার বাবার একটা টিনের ঘর ছিল, উঠোন নিয়ে মোট চার কাঠা জমি। উদ্বাস্তুদের জবরদখল জায়গা। সেইখানে ছেলেবেলা থেকেই নানা অশান্তিতে বড় হয়েছে। বাবা রোজ মাকে দা বা কুড়ুল নিয়ে কাটতে যেত, দিদি বাসন্তী গিয়ে আটকাত। মা আর দিদি তুজনেই ঝি-গিরি করে বেড়াত, বাবা ছিল কাঠের মিস্ত্রী, প্রায় দিনই কাজ জুটত না। তার ওপর লোকটার একটা ভয়ঙ্কর অর্শের যন্ত্রণা ছিল যার জন্য বেশীক্ষণ উবু হয়ে বসে কাজ করতে পারত না, রোজগার যা হত তাতে তুবেলা খাওয়া জুটে যেত মাত্র, তা সে যে ধরণের খাবারই হোক। দিদি বাসন্তীর চরিত্র খারাপ কেউ বলতে পারবে না। এখনো খারাপ নয়। তবে বাসন্তী যার সঙ্গে বিয়ে বসল তার আগের পক্ষের বউ আর চার-চারটে ছেলেমেয়ে আছে। জেনেশুনেই করল। সে লোকটার আবার বাসন্তীকে নিয়ে সন্দেহবাতিক— কোথাও বেরোতে দেয় না। এইসব ছেলেবেলা থেকে দেখছে কালু। বাবার মৃত্যু দেখেছে চোখের সামনে। অর্শ থেকেই খারাপ ঘা হয়ে গিয়ে থাকবে। রক্ত পড়ত দিনরাত। শেষদিকে ঐ রক্তপাতেই দিন দিন ক্ষীণ হয়ে হয়ে একদিন রাতে ঘুমিয়ে সকালে আর ওঠেনি। মা এখনো ঝি খেটে বেড়ায়, ছোট বোন হেমন্তীও বেরোচ্ছে কাজে, ছোট ভাই ভুতু আর হাবু সন্ধ্যাবাজারে ডিম বেচে আর চুরি করে বেড়ায়। ক্লাস নাইন পর্যন্ত উঠে কালুকে থামতে হল। পড়তে ভাল লাগত না।

সেই থেকে কালুর সব তুঃখবোধ আর নাকি-কান্না বিদায় নিয়েছে।

কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে সে। মনে কিছু ভুরভুরি কাটে না। গাল খেলে গাল দেয়, মার খেলে উল্টে মার দেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যস, এইভাবেই যতদিন বেঁচে থাকা যায়। কালু যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী ভালবাসতে শিখেছে তা হল টাকা। টাকার মতো কিছু হয় না।

সেলিমপুরে সওয়ারি ছেড়ে রিকশাওয়ালা মগন ফাঁড়ির উল্টোদিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বসেছিল। যাদবপুরে ফিরবে, সওয়ারি পাওয়ার লোভে খানিক অপেক্ষা করছিল।

কালু গিয়ে মগনকে বলল—নিয়ে চলো দেখি মগনদা।

—তোর গাড়ি কোথায় ?

—ছেড়ে এসেছি, পুলিস ধরে আনল একটু আগে।

মগন ঝুঁকে বলল—পুলিস! আই বাপ! কী হয়েছিল ?

—সে অনেক কথা, পরে কোনো সময়ে শুনো।

—পেঁদিয়েছে তোকে ?

—ও শালার সম্বন্ধীর পুতেরা কাকে না প্যাদায় ?

মগন রিকশার হুড তুলে দিয়ে বলল—চেপে বোস, শালারা আবার টের না পায় যে আমার গাড়িতে উঠেছিস!

মগন রিকশা ছেড়ে জোর হাঁকাল।

কালু কেৎরে বসেছিল তার সীটে, মারধর নয়, আসলে খিদেয় পেটব্যথা করছে। মদের ঝোঁকটা উবে গেছে কখন। এখন পেটে একটা চোঁ-ব্যথা। তবে তার মনটা এই ভেবে খুব ভাল লাগছিল যে পুলিসের হাতে পড়েও সে কারো নাম বলেনি।

এইট-বি বাস স্ট্যাণ্ডে ছেড়ে দিয়ে মগন বলল—মালিককে তিন দিনের পয়সা দিইনি।

কালু দাঁত বের করে বলল—আমার এক হপ্তার বাকি। কাল থেকে গাড়ি দেবে না। তার ওপর পুলিস লেগেছে।

—তুদিন জোর বৃষ্টি হলে ভাল সওয়ারি পাওয়া যায়।

—ইচ্ছেমতো তো আর বৃষ্টি হবে না।

মগন গাড়ি মালিকের বাড়িতে তুলে রাখতে বিজয়গড় গেল।

কালু স্টেশন রোডের মুখে খানিক দাঁড়িয়ে আর একটা রিকশা খুঁজল। পেল না, হাঁটতে লাগল। বাড়ি না গেলেও হয়। গরফা পর্যন্ত হাঁটতে ইচ্ছে করছে না খিদে পেটে।

স্টেশনের গায়ে একটা তেলেভাজার ঝোপড়ার দোকান আছে। সেটা চালায় বিশে, তার দোস্ত, সেখান গেলে কিছু খাবার জুটতে পারে। শোওয়ার জায়গার অভাব নেই, স্টেশনে গামছা পেতে পড়ে থাকলেই হল।

বিশে জেগে ছিল, ঝোপড়ায় হ্যারিকেন জ্বলছে। একটা বিদিকিচ্ছিরি কমদামের ট্রানজিস্টারে কোথাকার একটা পুরোনো হিন্দি গান হচ্ছে।

তাকে দেখে বিশে দাঁতের বিড়ি ফেলে দিয়ে বলল—পরশু মাল খাওয়াবি কথা ছিল।

কালু বলে—কাল খাওয়াবো।

—তোর শালা মুখ না ইয়ে।

—বেশী মেজাজ লিস না বিশে, আমার কচকচে সাড়ে চারশো টাকা আছে।

—যাঃ যাঃ!

—কিছু পেটের ব্যবস্থা হবে?

বিশে বলল—শালা রোজ এসে জ্বালালে এবার ঝাপড় খাবি।

তা বলে বিশে তাকে ফিরিয়ে দেয় না। মুড়ি, ছোলাসেদ্ধ আর ঠাণ্ডা বেগুনী খাওয়ায়। তারপর দুই বন্ধুতে বিড়ি ধরিয়ে গিয়ে স্টেশনে শুয়ে পড়ে গল্পগাছা করতে থাকে। বিশের মা ঝোপড়া আগলে রাখে।

বিশে সব শুনে বলে—তুই শালা ঘুণচক্করে পড়বি। খুনখারাবি নিয়ে দিল্লাগী নয় দোস্ত! সত্যি কথা বল তো কাউকে দেখেছিলি?

স্টেশনের শক্ত মেঝের ওপর চট পেতে শোয়া কালু পাশ ফিরে বিশের দিকে চেয়ে বিড়িতে টান মেরে বলে—তুই লাশটা দেখেছিলি ?

বিশে বলে—দেখব না কেন ? লাইনের ধারে দিনভর পড়েছিল। অনেকবার গিয়ে দেখেছি।

—চিনতে পেরেছিলি ?

বিশে মাথা নেড়ে বলে—খুব, ফলি গুণ্ডাকে কে না চেনে ? এসব জায়গাতেই আড্ডা ছিল। সব সময়ে ট্রেনে আসত আর ট্রেনেই চলে যেত।

—ট্যাবলেট বেচতে আসত যে আমিও জানি। কিন্তু ট্রেনে আসত কেন বল তো ?

—মনে হয় পাড়ায় ঢুকতে ভয় পেত। বাসেটাসে এলে তো বড় রাস্তা বা স্টেশন রোড় ধরে আসতে হবে। ওসব জায়গায় ওর কোনো বিপদ ছিল মনে হয় !

কালু আর একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে—লুকিয়েচুরিয়ে আসত তাহলে !

বিশে গম্ভীর হয়ে বলে—কিন্তু ফলিরও দল ছিল। সন্তোষপুর, পালবাজার, স্টেশন রোড এসব এলাকার বিস্তর মস্তান ছিল ওর দোস্ত। আমার দোকানে এসে ইঁট পেতে বসে কতদিন দিশি মাল আর তেলেভাজা খেয়েছে।

—তুই তাহলে ভালই চিনতি ?

—বললাম তো। তুই খুনটা নিজে চোখে দেখলি ?

—নিজের চোখে।

—খুনীকেও চিনলি ?

কালু হেসে বলে—নাম বলব না তা বলে। চিনলাম।

বিশে একটা আস্তে লাথি মারল কালুর পাছায়।

তারপর বলল—মালকড়ি ঝাঁকবি ?

—ঝেঁকেছি, কাল তোকে মাল খাওয়াবো।

বিশে ঘুমোয়। কালুর অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। গালটা ফুলে টনটনে ব্যথা হয়েছে। মাজাতেও ব্যথা বড় কম নয়। এপাশ ওপাশ করে সে একটু কোঁকাতে থাকে।

শেষরাত্তের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল কালু। উঠতে অনেক বেলা হল। দেখল, বিশে উঠে গেছে। স্টেশনে লোকজন গিজগিজ করছে।

লাইন পার হয়ে কালু পাড়ায় ঢুকে বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে।

দরজায় পা দিতে না দিতেই মা চেঁচিয়ে বলে—হারামজাদা বজ্জাত, কার সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলি? কাল রাতে চারটে গুণ্ডা এসে বাড়ি তছনছ করেছে। ছেলেবুড়োকে ধরে কী হেনস্থা, যা বাড়ি থেকে দূর হয়ে। গুণ্ডা বদমাশ কোথাকার।

॥ সাত ॥

নানক চৌধুরীর পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে পাড়ার অনেকখানি দেখা যায়।

ঘরে নানক চৌধুরী একাই থাকে। বাড়ির কারো সঙ্গেই হলাহলি গলাগলি নেই, এমন কি স্ত্রীর সঙ্গেও না। নিজের ঘরে বইপত্র আর নানান পুরাদ্রব্যের সংগ্রহ নিয়ে তার দিন কেটে যায়। কাছেই একটি কলেজে নানক অধ্যাপনা করে। না করলেও চলত, কারণ টাকার অভাব নেই।

টাকা থাকলে মানুষের নানারকম বদখেয়াল মাথা চাড়া দেয়। নানক চৌধুরী সেদিক দিয়ে কঠোর মানুষ। মদ মেয়েমানুষ দূরের কথা নানক সুপুরিটা পর্যন্ত খায় না। পোশাকে বাবুয়ানি নেই, বিলাসব্যসন নেই। তবে খরচ আছে। জমানো টাকার অনেকটাই নানকের খরচ হয় হাজারটা পুরাদ্রব্য কিনতে গিয়ে।

ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও নানক প্রত্নবিদ নয়। তাই সেসব জিনিস কিনতে গিয়ে সে ঠকেছেও বিস্তর। কেউ একটা পুরোনো মূর্তি কি প্রাচীন মুদ্রা এনে হাজির করলেই নানক ঝটপট কিনে ফেলে। পরে দেখা যায় যে জিনিসটা ভুয়া। মাত্র দিনসাতেক আগে একটা হাঘরে লোক এসে মরচে-ধরা একটা ছুরি বেচে গেছে। ছুরিটা নাকি সিরাজদ্দৌলার আমলের। প্রায় নশো টাকা দণ্ড দিয়ে সেটা রেখেছে নানক।

দেখলে নানককে বেশ বয়স্ক লোক বলে মনে হয়। দাড়ি গোঁফ থাকায় এখন তো তাকে রীতিমতো বুড়োই লাগে। কিন্তু সন্তু যদি তার বড় ছেলে হয়, তাহলে তার বয়স খুব বেশী হওয়ার কথা নয়। নানকের হিসেবমতো তার বয়স চল্লিশের কিছু বেশী।

রাত বারোটা নাগাদ নানক তার পশ্চিমধারের জানালায় দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে পাড়ার বড় রাস্তা দেখা যায়। পাশের বাড়িটা নীচু একটা একতলা। তার পরেই নরেশের বাড়ির ভিতরদিকের উঠোন। উঠোনে আলো নেই বটে, তবে বাড়ির ভিতরকার আলোর কিছু আভা এসে উঠোনে পড়েছে। লোকজন কাউকে দেখা যায় না। এত রাতে আলো বা লোকজন দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। তবে আজকের ব্যাপার আলাদা। ফলি নামে কে একটা ছেলে লাইনের ধারে মারা গেছে, তাকে নিয়ে নানা গুজব। কেউ বলছে খুন। একটা রিক্সাওয়ালা খুনীর নাম বলেছে গগন। এই নিয়ে পাড়ায় ভীষণ উত্তেজনা। প্রায় সবাই জেগে গুজগুজ ফুসফুস করছে।

গুজব নানকের পছন্দ নয়। সে জানে কংক্রিট ফ্যাক্ট ছাড়া কোনো ঘটনাই গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাস্য নয়। তার নিজের বিষয় হল ইতিহাস, যা কিনা বারো আনাই কিংবদন্তীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশই কেচ্ছাকাহিনী। তাছাড়া ইতিহাস মানেই হচ্ছে রাজা বা রাজপরিবারের উত্থানপতনের গন্ধ। তাই

ইতিহাস সাবজেক্টটাকে দু চোখে দেখতে পারে না নানক। তার ইচ্ছে এমন ইতিহাস লেখা হোক যা সম্পূর্ণ সত্যমূলক এবং সমাজবিবর্তনের দলিল হয়ে থাকবে। ইতিহাস মানে গোটা সমাজের ইতিহাস। কিন্তু পাঠ্য প্রাচীন ইতিহাসগুলো সেদিক থেকে বড়ই খণ্ডিত।

নানক দাঁড়িয়ে চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিল। চারিদিক কারপৃথিবী সম্পর্কে সে এখন কিছুটা উদাস এবং নিস্পৃহ। তার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থটি হল রবিনসন ক্রুশো। এই প্রায় শিশুপাঠ্য বইটি যে কেন তার প্রিয় তা এক রহস্য। তবে নানক দেখেছে, যখনই তার মন খারাপ হয় বা অস্থিরতা আসে তখন রবিনসন ক্রুশো পড়লেই মনটা আবার ঠিক হয়ে যায়। শুনলে লোকে হাসবে কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

আজ বিকেল থেকে নানকের মনটা খারাপ, তার প্রত্নবিদ বন্ধু অমলেন্দু এসেছিল, ছুরিটা নেড়েচেড়ে দেখে বলেছে, "এ হল একেবারে ব্রিটিশ আমলের বস্তু। বয়স ষাট-সত্তর বছরের বেশী নয়। তবে একটু ঐতিহাসিক নকলে তৈরী হয়েছিল বটে। ন'-ন'শোটা টাকা গালে চড় দিয়ে নিয়ে গেছে হে!"

নানক চৌধুরী তখন থেকেই রবিনসন ক্রুশো পড়ে গেছে। এখন মনটা অন্যমনস্ক। নানক চৌধুরী নিজেকে সেই নিরালা দ্বীপবাসী রবিনসন ক্রুশো বলে ভাবতে ভারী ভালবাসে। সে যদি ওরকম জীবন পায় তবে ফ্রাইডের মতো কোনো সঙ্গীও জোটাবে না। একদম একা থাকবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে নানক হঠাৎ নরেশের বাড়ির উঠোনে টর্চের আলো দেখতে পায়। সেই সঙ্গে দুটো ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি হলেও চিনতে অসুবিধে নেই। বিপুল মোটা বেঁটে শোভারানীকে অন্ধকারেও চেনা যায়। আর গরিলার মতো হোঁৎকা জোয়ান চেহারার গগনকেও ভুল হওয়ার কথা নয়।

দুজনে করছে কি ওখানে? কোনো লাভ-অ্যাফেয়ার নয় তো!

একটু বাদেই নানক দেখে গগন দেয়াল ডিঙোচ্ছে। শোভারানী টর্চ জ্বেলে ধরে আছে। গগন দেয়ালের ওপাশে নেমে যেতে না যেতেই পুলিসের গাড়ির আওয়াজ রাস্তায় এসে থামে। ভারী বুটের শব্দ। কিছু টর্চের আলো এলোমেলো ঘুরতে থাকে।

তাহলে এই ব্যাপার।

নানক চৌধুরী লুঙ্গির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘর থেকে বেরোয়। নিজের ঘরে তালা দেওয়া তার পুরোনো অভ্যাস। বাড়ির কারো বিনা প্রয়োজনে তার ঘরে ঢোকা নিষেধ। তালা দিয়ে নানক নীচে নেমে আসে। চাকরকে ডেকে সদর দরজা বন্ধ করতে বলে রাস্তায় বেরোয়।

মুখোমুখি একজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে দেখা। নানক বলে—কাউকে খুঁজছেন?

অফিসার বলে—হ্যাঁ। গগন নামে কাউকে চেনেন?

—চিনি।

—লোকটা ঘরে নেই। পালিয়েছে।

নানক বলে—হ্যাঁ। আমি পালাতে দেখেছি।

—কোন্ দিকে?

—পিছনের দেয়াল টপকে ল্যাবরেটারির মাঠ দিয়ে। এখন আর তাকে পাবেন না। বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে।

—কখন গেল?

—মিনিট দশ-পনোরো হবে। নরেশ মজুমদারের স্ত্রীও ছিল। পালাবার সময় টর্চ দেখাচ্ছিল।

—আপনি কে?

—নানক চৌধুরী। প্রফেসর।

নানক চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে পুলিস অফিসার খুব বেশী প্রভাবিত হননি। শুধু বললেন—পালিয়ে যাবে কোথায়?

এত রাতেও পাড়ার লোক মন্দ জমেনি চারদিকে। তাছাড়া চারিদিকের বাড়ির জানালা বা বারান্দায় লোক দাঁড়িয়ে দেখছে।

রাস্তার ভিড় থেকে সুরেন খাঁড়া এগিয়ে এসে একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে—মদনদা, তোমরা একটা মাতাল আর চ্যাংড়া রিকশাওলার কথায় বিশ্বাস করে অ্যারেস্ট করতে এলে, এটা কেমন কথা ?

পুলিস অফিসারের নাম মদন। সুরেনের সঙ্গে এ অঞ্চলের সকলের খাতির। অফিসার একটু ভ্রূ কুঁচকে বলেন—অ্যারেস্ট করতে এসেছি বললে ভুল হবে। আসলে এসেছি এনকোয়ারিতে। তা তুমি কিছু জানো নাকি সুরেন ?

—কি আর জানব ? শুধু বলে দিচ্ছি, কালুর কথায় নেচো না। ও মহা বদমাশ। গগনকে আমরা খুব ভাল চিনি। সে কখনো কোনো ঝঞ্ঝাটে থাকে না।

—থাকে না তো পালাল কেন ?

—সে পালিয়েছে কে বলল ! পালায়নি। হয়তো গা-ঢাকা দিয়েছে ভয় খেয়ে। মদনদা, তোমাদের কে না ভয় খায় বলো ?

পুলিস অফিসার একটু হেসে বললেন—আরো একজন এভিডেনস্ দিয়েছে, শুধু কালুই নয়।

—কে ?

—গগনবাবুর ল্যাণ্ডলর্ড নরেশ মজুমদার। আবার এই প্রফেসর ভদ্রলোক বলছেন যে, গগনের সঙ্গে একটু আগেই নাকি মিসেস মজুমদারকেও দেখা গেছে। তোমাদের এ পাড়ার ব্যাপার-স্যাপার বেশ ঘোরালো দেখছি।

নরেশ মজুমদার এতক্ষণ নামেনি। এইবার নেমে আসতে সবাই তার চেহারা দেখে অবাক। রাস্তার বাতি, পুলিসের টর্চ আর বাড়ির আলোয় জায়গাটা ফটফট করছে আলোয়। তাতে দেখা গেল নরেশ মজুমদারের চোখে-মুখে স্পষ্ট কান্নার ছাপ। চুলগুলো

এলোমেলো। গায়ে জামা গেঞ্জি কিছু নেই, পরনে একটা লুঙ্গি মাত্র।

নরেশ নেমে এসেই মদনবাবুকে হাতজোড় করে বলে—ভিতরে চলুন। আমার কিছু কথা আছে।

মদন স্থরেনের দিকে ফিরে একটু চোখ টিপলেন। প্রকাশ্যে বললেন—স্থরেন, তুমি তো পাড়ার মাথা, তা তুমিও না হয় চলো সঙ্গে।

নরেশ বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!

স্থরেন খুব ডাঁটের সঙ্গে বলে—নরেশবাবু কথা আপনার যাই থাক, বিনা প্রমাণে আপনি গগনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভাল কাজ করেননি। কাল সন্ধ্যেবেলা গগন জিমনাসিয়ামে ছিল, ত্রিশ-চল্লিশ জন তাব সাক্ষী আছে।

নরেশ গম্ভীরমুখে বলে—সব কথা ভিতরে গিয়েই হোক। রাস্তাঘাটে সকলের সামনে এসব বলা শোভন নয়। আস্থন।

নরেশের পিছু পিছু স্থরেন আর মদন ভিতরে ঢোকে।

নানক চৌধুরী ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। তাকে ওরা বিশেষ গ্রাহ্য করল না। অথচ একটা অতি গুরুতর ব্যাপারের সে প্রত্যক্ষদর্শী।

ঘরের একধারে একটা রিভলভিং চেয়ারে বেগম আধশোয়া হয়ে চোখ বুজে আছে, কপালে একটা জলপট্টি লাগানো, ডান হাতের ছুটো আঙুলে কপালের ছুধার চেপে ধরে আছে। তার কান্না শোনা যাচ্ছে না, তবে মাঝে মাঝে হেঁচকির মতো শব্দ উঠছে।

শোভারাণী ভিতরের দরজায় অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। তার ছু চোখে বেড়ালের জ্বলন্ত

নরেশ মজুমদার যখন তার অতিথিদের এনে ঘরে ঢুকল তখন শোভারাণীর ঠোঁটে একটা হাসি একটু ঝুল খেয়েই উড়ে গেল।

বেগম একবার রক্তরাঙা চোখ মেলে তাকায়। আবার চোখ বুজে বসে থাকে।

নরেশ মজুমদার বেগমের দিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে মদনের দিকে চেয়ে বলে—ঐ হল ফলির মা, আমার শালী।

মদন গম্ভীরমুখে বলে—ওসব আমরা জানি।

নরেশ মজুমদার এ কথায় একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—এতক্ষণ আমি আমার শালীর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম।

মদন আর স্থুরেন ছুটি ভারী নরম সোফায় বসে। স্থুরেন বলে—অনেক রাত হয়েছে নরেশবাবু, কথাবার্তা চটপট সেরে ফেলুন।

নরেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ স্থুরেনের দিকে চেয়ে বলে—আপনি বলছিলেন গতকাল গগন সন্ধ্যেবেলায় জিমনাসিয়ামে ছিল। আপনি কি ঠিক জানেন ছিল?

—আলবৎ। স্থুরেন ধমকে ওঠে।

নরেশ মাথা নেড়ে বলে—না স্থুরেনবাবু, গগন সন্ধ্যেবেলায় জিমনাসিয়ামে ছিল না। সে সন্ধে সাতটার পর ব্যায়াম শেখাতে আসে। তারও সাক্ষী আছে।

স্থুরেন পা নাচিয়ে বলে—এ এলাকায় গগনকে সবাই চেনে নরেশবাবু। সে দেরি করে জিমনাসিয়ামে এলেও কিছু প্রমাণ হয় না। জিমনাসিয়ামে যাওয়ার আগে সে কোথায় ছিল সেইটাই তো আপনার জিজ্ঞাস্য? তার জবাবে বলি, যেখানেই থাক লুকিয়ে ছিল না। আপনি গগনের পিছনে লেগেছেন কেন বলুন তো।

এ কথা শুনে বেগম আবার তার রক্তরাঙা চোখ খুলে তাকাল। সোজা স্থুরেনের দিকে চেয়ে কান্নায় ভাঙা ও ভারী স্বরে বলল—গগনবাবু কাল সন্ধ্যেবেলা কোথায় ছিলেন তা কি আপনার জানা আছে?

—না।

—তাহলে জামাইবাবুকে খামোকা চোখ রাঙাচ্ছেন কেন? যদি জানা থাকে তাহলে সেটাই বলুন।

মদন কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার বলল—ও সব কথা থাক। সাসপেক্ট কোথায় ছিল না-ছিল সেটা পরে হবে। আপাতত আমি জানতে চাই আপনারা কোন ইনফর্মেশন দিতে চান কিনা, আজেবাজে খবর দিয়ে আমাদের হ্যারাস করবেন না। কংক্রীট কিছু জানা থাকলে বলুন।

নরেশ মজুমদার বলল—ফলি কি খুন হয়েছে?

মদন গম্ভীর মুখে বলে—পোস্টমর্টেমের আগে কি করে তা বলা যাবে?

—খুন বলে আপনাদের সন্দেহ হয় না?

—আমরা সন্দেহ-টন্দেহ করতে ভালবাসি না। প্রমাণ চাই।

—কিন্তু আই উইটনস তো আছে।

সুরেন ফের ধমকে ওঠে—উইটনেস আবার কি? একটা বেহেড মাতাল কি বলেছে না বলেছে সেটাই ধরতে হবে নাকি?

শোভারানী এতক্ষণ চুপ ছিল, এবার সামান্য সুর করে নরেশকে বলল—তোমার অত দরদ কিসের বলো তো?

—তুমি ভিতরে যাও।

—কেন, তোমার হুকুমে নাকি?

নরেশ রেগে গিয়ে বলে—যাবে কি না।

—যাবো না। আমারও কথা আছে।

—কী কথা?

—তা পুলিসকে বলব।

মদন হাই তুলে বলল—দেখুন, এখনো কেসটা ম্যাচিওর করেনি চিলে কান নেওয়ার বৃত্তান্ত। খুন না দুর্ঘটনা কেউ বলতে পারছে না। আপনারা কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?

নরেশ বলল—যদি খুনটাকে দুর্ঘটনা বলে চালানোর ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে ?

—কিন্তু খুনের তো কিছু কংক্রীট প্রমাণ বা মোটিভ থাকবে।

নরেশ বলল—আপনারা পুলিসের কুকুর আনালেন না কেন ? আনলে ঠিক—

মদন হেসে উঠে বলে—কুকুরের চেয়ে মানুষ তো কিছু কম বুদ্ধি রাখে না। আপনার যা বলার বলুন না।

বেগম তার রিভলভিং চেয়ার আধপাক ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বলে—আমাদের তেমন কিছু বলার নেই। তবে আমাদের যা সন্দেহ হচ্ছে তা আপনাদের বলে রাখলাম। আপনারা কেসটা চট করে ছেড়ে দেবেন না বা অ্যাকসিডেণ্ট বলে বিশ্বাস করবেন না।

—ঠিক আছে। এ ছাড়া আর কিছু বলবেন ?

—গগনবাবুকে আপনারা ধরতে গেলেন না ?

—কেন ধরব ? মদন অবাক হয়ে বলে।

—ধরতেই তো এসেছিলেন !

মদন হেসে বলল—হুটহাট লোককে ধরে বেড়াই নাকি আমরা ?

—তাহলে কেন এসেছিলেন ?

—আপনার জামাইবাবু আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাছাড়া কালুও কিছু কথা আমাদের কাছে বলেছে। আমরা তাই গগনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—উনি তো পালিয়ে গেলেন। তাইতেই তো প্রমাণ হয় ওঁর দোষ কিছু না কিছু আছে।

সুরেন ঝেঁকে উঠে বলে—না, হয় না।

নরেশ বলে—কালু যে গগনকে দেখেছে নিজের চোখে সেটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন ?

এবার পুলিস অফিসার মদন একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে—নরেশবাবু, কালু কিন্তু কারো নাম বলেনি। আর গগনবাবু যে পালিয়েছেন

সেও গট্-আপ ব্যাপার হতে পারে। কারণ পাড়ার একজন বলছেন যে একটু আগ আপনার স্ত্রীই নাকি তাঁকে পালাতে সাহায্য করেছেন।

॥ আট ॥

ট্যাক্সিতে বসে গগন কিছুক্ষণ মাথা এলিয়ে চোখ বুজে রইল। মাথাটা বড্ড গরম, গাও গরম। মনের মধ্যে একটা ধাঁধা লেগে আছে।

গোলপার্কের কাছবরাবর এসে ট্যাক্সিওলা জিজ্ঞেস করল— কোন্ দিকে যাবেন?

কোন্ চুলোয় যাবে তা গগনের মাথায় আসছিল না। কলকাতায় তার আত্মীয়স্বজন বা চেনাজানা লোক হাতে গোনা যায়। কালীঘাটে এক পিসি থাকে। কিন্তু পিসির অবস্থা বেশী ভাল নয়। ছেলের বৌয়ের সংসারে বিধবা পিসি কোল ঘেঁষে পড়ে থাকে, তার কথার দাম কেউ বড় একটা দেয় না। তাছাড়া আপন পিসিও নয়, বাবার মামাতো বোন।

আর এক যাওয়া যায় ছটকুর কাছে। বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ হয় না বটে কিন্তু ছটকু একসময়ে গগনের সবচেয়ে গা-ঘেঁষা বন্ধু ছিল।

গগনের বন্ধু মানেই গায়ের জোরওলা, পেশীবাহুল মানুষ। ছটকু ঠিক তা নয়। আড়েবহরে ছটকু খুব বেশী হবে না। সাড়ে পাঁচ ফুটিয়া পাতলা গড়নের ছমছমে চেহারা। তবে কিনা ছটকু একসময়ে বালিগঞ্জ শাসন করত। আর সেটা করত বুদ্ধির জোরে। মারপিট করতে ছটকুকে কম লোকই দেখেছে। তবে দারুণ

তেজী ছেলে, দরকার পড়লে ছু হাজার লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে। ফেদারওয়েটে ভাল বকসার ছিল কলেজে পড়ার সময়। গগন যখন কলেজে পড়তে আসে ঐ ছটকু ছিল তার ক্লাসের বন্ধু, পরে জিমনাসিয়ামে গায়ের ঘাম ঝরাতে গিয়ে পরিচয়টা আরো গাঢ় হয়।

বকসিং ছটকু খুব বেশীদিন করেনি, কলেজের প্রথম দিকে খুব লড়ালড়ি করল কিছুদিন। ফোর্ট উইলিয়ামে এক কমপিটিশনে জিতেও গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই পড়াশুনোর তাগিদে সেসব ছেড়ে ভাল ছাত্র হয়ে গেল। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ত। ফার্স্ট ক্লাস পেল, এম এস-সিতেও তাই। কিছুদিন বোমবাই গিয়ে চাকরি করল। সেখান থেকে গেল বিলেত, বিলেতে নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে কিছুদিন ভুগে ছ মাস বাদে ফিরে এল। বলল—বিলেত কি আমাদের পোষায়! টাকাটাই গচ্চা।

ছটকু বড়লোকের ছেলে। তার বাবা সরকারী ঠিকাদার, জাহাজের মাল খালাস করার ব্যবসাও আছে। এলাহী বাড়ি, এলাহী টাকা। বিলেত থেকে ফিরে এসে ছটকু কলকাতায় চাকরি নেয়। গগন কিছুদিন আগে খবর পেয়েছে যে ছটকু চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করছে, খুব বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং বৌয়ের সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না।

কোনো মানুষই নিখাদ সুখে থাকে না। পৃষ্ঠব্রণ একটা না একটা থাকবেই। ভেবে গগন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ট্যাক্সিওলাকে বলল —ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস।

ছটকুদের বাড়িটা এত রাতেও জেগে আছে। পুরোটা জেগে আছে বললে ভুল হবে। দোতলা তেতলার বেশীর ভাগই অন্ধকার। তবু দু'চারটে জানালায় আলো জ্বলছে। দোতলার বাঁদিকের কোণের ঘরটা ছটকুর। তাতে আলো দেখা যাচ্ছে। সদরটা খোলা। দুটো দারোয়ান বসে কথা কইছে।

গগন ট্যাক্সি ছেড়ে নেমে সদরে উঠতেই দারোয়ানদের একজন বলে ওঠে—কাকে চাইছেন ?

—ছটকু আছে ?

—আছে।

—একটু ডাকবে ওকে ? বড় দরকার। বলো গগন এসেছে।

—দেখি। বলে দারোয়ান ভিতরে গেল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করতে হল। হঠাৎই পায়জামা আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা ছটকু দরজায় দেখা দিয়ে অবাক হয়ে বলে—তুই কোত্থেকে রে ?

—কথা আছে। রাতের মতো একটু থাকতে দিবি ?

—হোল লাইফ থেকে যা না। আয় আয়।

গগন শ্বাস ফেলে বাঁচল। ছটকুর বউকে সে চেনে না। সে মহিলা কেমন হবে কে জানে। যেখানে মহিলারা সুবিধের নয় সেখানে থাকা বড় জ্বালা। তার ওপর ছটকুর সঙ্গে তার বউয়ের বনিবনা নেই বলে শুনেছে। তাই স্বস্তির মধ্যেও একটু কাঁটা বিঁধে রইল মনে। নিখাদ সুখ বলে তো কিছু নেই।

ছটকুর পিছু পিছু দোতলায় উঠে এল গগন। এ বাড়িতে সে আগেও এসেছে। বড়লোকদের বাড়ি যেমন হয় তেমনি সাজানো। যেখানে কার্পেট পাতা নেই সেখানকার মেঝে এত তেলতেলে আর ঝকঝকে যে পা পিছলে যেতে পারে।

ছটকুর ঘর তিনটে। কোণেরটা শোওয়ার ঘর। ঢুকতেই বিশাল একটা বসবার ঘর। বাঁদিকেরটা স্টাডি। বরাবর তিনখানা ঘর ছটকু একা ভোগ করেছে। এসব দেখে নিজের গ্যারেজের ঘরখানার কথা ভাবলে গগনের হাসি পায়। মানুষে মানুষে অবস্থার পার্থক্য কী বিপুল আশমান জামিন!

বসবার ঘরে মেঝে ঢাকা পুরু উলের গালচে। গাঢ় খুনখারাপী রঙের। দারুণ সব সোফা আর কৌচ, বিশাল রেডিওগ্রাম, টি-ভি

সেট, বুক কেস, কাঁচের শো-বকস্। দরজায় পর্দার বদলে লম্বা হয়ে ঝুলছে সুতোয় গাঁথা বড় বড় পুঁতির মালা।

ছটকু তাকে বসিয়ে একটা চাকা লাগানো পোর্টেবল রুম এয়ার কণ্ডিশনার কাছে টেনে এনে চালু করল। হিমঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল গগনের শরীরে। বড় ভাল হাওয়াটা।

ক্যাম্বিসের ব্যাগটা মেঝেয় রেখে গগন একটা আরামের 'আঃ' শব্দ করে চোখ বুজে থাকে। মুখোমুখি বসা ছটকু কিন্তু একটা প্রশ্নও করেনি। চুপ করে বসে একটা পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগল, সময় দিল গগনকে।

গগন খানিক বসে থেকে হঠাৎ বুঝতে পারল যে এবার তার কিছু বলা উচিত। ছটকু কী ভাবছে ?

গগন বলে—তোর বউ ঘুমিয়েছে ?

—কেন ? ছটকুর মুখে দুষ্টুমির হাসি।

—না, বলছিলাম কি পাশের ঘরে উনি এখন ঘুমিয়ে আছেন আর আমরা কথাবার্তা বলছি—এতে ওঁর ডিসটার্ব হতে পারে।

নিভন্ত পাইপটা আবার ধরিয়ে ছটকু মৃদুস্বরে বলে—ঘুমোয়নি, একটু আগেই কথা হচ্ছিল।

গগন আড়চোখে দেখে পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। জোরালো আলো নয়, মিষ্টি একটা হলুদ আভার বাতি। শোওয়ার ঘরের দরজায় ফুটফুটে সাদা জালি পর্দা ঝুলছে। ওপাশে যে মহিলা আছেন তিনি গগনকে কী চোখে দেখবেন সেইটাই সমস্যা।

গগন বলল—একটু বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি।

ছটকু হেসে বলে—গগ, বিপদটা একটু নয়। একটু বিপদে পড়ে এত রাতে তুই আসিসনি।

বরাবরই ছটকু তাকে গগ, বলে ডাকে। প্রথম জীবনে ছটকু তার নাম' দিয়েছিল গগ্যাঁ। গগন থেকে গগ্যাঁ, বিশ্ববিখ্যাত আঁকিয়ে গগ্যাঁর সঙ্গে নাম মিলিয়ে। পরে আর এক আর্টিস্টের

নামের সঙ্গে মিলিয়ে গগ্ বলে ডাকত। ছটকুর ঐ স্বভাব, যে কারো নামই খানিকটা পাল্টে বা বিকৃত করে ডাকবে।

গগন রুমালে মুখ গলা মুছে বলল—বিপদটা কঠিন বলে মনে হয় না। তবে আমার একজন হিতৈষিণী আমাকে পালানোর পরামর্শ দিয়েছে।

—হিতৈষিণীটি কে?

—ল্যাণ্ডলর্ডের বউ। নাথিং রোমান্টিক।

—অ। আর বিপদটা?

—একটা খুনের ব্যাপার।

—খুন! বলে ভ্রূ তোলে ছটকু।

গগনের হাসি আসে না, তবু দাঁত দেখিয়ে গগন বলে—খুন কিনা জানি না। তবে কেউ কেউ বলছে খুন। আর তাতে আমাকে ফাঁসানোর একটা চেষ্টা হয়েছে।

ছটকু কী একটা বলতে গিয়েও হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে সামলে গেল কিছু একটা টের পেয়েছিল ছটকু। কারণ কথাটা গগন শেষ করার পরপরই শোওয়ার ঘর থেকে একটি মেয়ে বাতাসে ভেসে আসবার মতো এঘরে এল। ভারী উদাসীন নিঃশব্দ আর অনায়াস হাঁটার ভঙ্গী।

এত সুন্দর মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। যেমন গায়ের রং, তেমনি ফিগার আর মুখখানা। এইসব মুখের জন্য দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। লম্বাটে, পুরন্ত, ধারালো সুন্দর সেই মুখশ্রী, ভারী দুখানা চোখের পাতা আধবোজা। অল্প একটু লালচে চুলের ঢল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, পরনে একটা রোব।

ঘরে ঢুকে গগনের দিকে দু-এক পলক নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকে মেয়েটি। ঘরটা এক সুগন্ধে ভরে যায়।

ছটকু ওর দিকে পিছন ফিরে বসে ছিল। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল—লীনা, এ আমার বন্ধু গগন চৌধুরী।

লীনা কথা বলল না। যবে একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল—নাইস টাইম ফর এ ফ্রেণ্ড টু কল।

ছটকুও সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বলে—লীভ ইট।

লীনা বসবার ঘরের পিছনে বড় পর্দার ওপাশে আড়ালে চলে যায়।

ছটকু আবার পাইপ ধরিয়ে বলে—কী খাবি?

—খাবো? গগন অবাক হয়ে বলে—খাবো কী রে?

—না খেয়ে থাকবি নাকি? নাকি লজ্জাটজ্জা পাচ্ছিস?

বাস্তবিক গগন লজ্জা পাচ্ছিল। সঙ্গে আবার একটু ভয়ও। এইমাত্র ছটকুর বউ লীনা অ্যায়সা দারুন অ্যাকসেণ্টে ইংরিজি বুলি ঝেড়েছে যে তাতেই গগন থমকে গেছে, ইংরিজিটা তো মেমসাহেবের মতো বলেই, তার ওপর মেজাজও সেই পর্দায় বাঁধা। তাই গগন বড় ভীতু-সীতু হয়ে পড়েছে।

ছটকু একটু হাসল। বরাবর ছটকুর মাথা ক্ষুরের মতো ধারাল। টক করে অনেক কিছু বুঝে নেয়। গগনের ব্যাপারটাও বুঝে নিয়ে বলল—ঘাবড়াচ্ছিস? কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার ঘর এটা, আমিই মালিক। তোর কে কি করবে?

গগন বলে—আরে দূর! ওসব নয়। আমার খিদেও নেই।

—অত বড় শরীরটায় খিদে নেই কি রে? দাঁড়া, ফ্রিজে কিছু আছে কিনা লীনাকে দেখতে বলছি।

এই বলেই বেশ গলা ছেড়ে দাপটে হাঁক দিল ছটকু—লীনা! এই লীনা—

অত্যন্ত ভয়াবহ মুখে লীনা পর্দা সরিয়ে দেখা দেয়। চুলের একটা ঝাপটা তার অর্ধেক মুখ ঢেকে রেখেছে, চোখে সাপের চাহনি; মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে বলে—চেঁচিয়ে কি নিজেকে অ্যালার্ট করতে চাইছো? কী বলবে বল।

ছটকু সুখে নেই তা গগন নিজের দুঃখ-দুশ্চিন্তার মধ্যেও বুঝতে

পারে। মেয়েছেলেরা অ্যায়সা হারামী হয় আজকাল।

ছটকু গম্ভীর মুখে কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় বলে—গগনকে কিছু খেতে দাও।

লীনা খুব অবাক হয়ে গগনের দিকে তাকায়। এত রাতে একটা-উটকো লোক এসে খেতে চাইবে এট যেন কল্পনার বাইরে।

গগন মিন মিন করে বলল—না, না, আমার কিছু লাগবে না।

—লাগবে, ছটকু ধমক দেয়।

লীনা অবাক ভাবটা সামলে নিয়ে খুব চাপা সরু গলায় বলে—তা সেটা আমাকে হুকুম করছো কেন? বেল বাজালেই সামু আসবে। তাকে বোলো।

—বেলটা তুমিই না হয় বাজালে!

গগন না থাকলে লীনা আরো ঝামেলা করত। সেটা গগন ওর চোখের ঝাঁজালো কটাক্ষেই বুঝল। কিন্তু মুখে কিছু না বলে দেয়ালের একটা বোতাম একবার টিপে দিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেল।

ছটকু গগনের দিকে তাকিয়ে একটু যেন জয়ের হাসি হাসে। তবে হাসিটাতে বিষ মেশানো। আবার নিভে যাওয়া পাইপ ধরায়। বলে—বেশ আছি।

গগন একটু ঘামে। এয়ারকুলার যথেষ্ট ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়ে তাকে জমিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তবু গগন ঠাণ্ডা হচ্ছে না তেমন। পকেটে এক গোছা নোট ভরে দিয়েছে শোভা। কেন দিয়েছে, কত দিয়েছে। তা ভাববার বা দেখবার সময় পায়নি গগন। তবে দিয়েছে ঠিকই। এই টাকায় গগন বরং গিয়ে একটা হোটেলে উঠলে ভাল করত। এখানে এসে উপরি ঝামেলা পোয়াতে হত না। দুটো মানুষের লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে তখন তার ফাঁপর অবস্থা।

ধোপদুরস্ত পায়জামা আর শার্ট পরা চাকর সামু এল। ছটকুর হুকুমে তক্ষুনি গিয়ে কোত্থেকে খাবার এনে ডাইনিং হলে সাজিয়ে দিল।

ছটকুর তাড়ায় গিয়ে খেতেও বসল গগন। বড়লোকের বাড়ি বটে কিন্তু এরা অখাদ্য ইংরিজি খানা খায়। এক পট সাদা মাংস দেখে সরিয়ে রাখল গগন। মাংস খায়ই না সে। দুটো চীজ স্যাণ্ডউইচ ছিল মস্ত মস্ত। একখানা কামড়ে তার তেমন ভাল লাগল না। তবে টমেটো আর চিলি সস দিয়ে কোনোক্রমে গিলল সেটা। দ্বিতীয়টা ছুঁল না। এক বাটি সব্জী দিয়ে রান্না ডাল ছিল, সেটা খেল চুমুক দিয়ে।

ছটকু উল্টোদিকে বসে তার খাওয়া দেখছে। সামু সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়ালো।

গগন বেসিনে হাত ধুয়ে বলল—তুই বুঝছিস না ছটকু, খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা নয়।

ছটকু জবাব দেয় না। গগনকে নিয়ে ড্রইংরুম পার হয়ে স্টাডিতে ঢোকে। দরজা থেকেই ফিরে সামুকে হুকুম দেয়—এই সাহেবের বিছানা লাগিয়ে দাও স্পেয়ার রুমে।

স্টাডির দরজা বন্ধ করে ছটকু মস্ত সেকরেটারিয়েট টেবিলটার ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে। টেবিলবাতি জ্বলছিল বলে ঘরটা আবছা। দুটো এয়ারকুলার চালু আছে বলে বেশ ঠাণ্ডা। নিঃঝুমও বটে। এত নিস্তব্ধ ঘর গগন আর দেখেনি। মনে হয় খুব ভাল ভাবে সাউণ্ডপ্রুফ করানো আছে। তাই হবে। দেয়ালে ছোট ছোট অজস্র ছিদ্র। রেডিও স্টেশনের স্টুডিওতে গগন এরকম দেখেছে। একবার আকাশবাণীর বিদ্যার্থীমণ্ডলে সে স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলেছিল, তখন দেখেছে, সাউণ্ডপ্রুফ স্টুডিওর দেয়ালে এরকম ফুটো থাকে। কথা বললে কোনো প্রতিধ্বনি হয় না।

এখানেও হল না। গগন বলল—তোকে খুব জ্বালাচ্ছি।

ছটকু মাথা নেড়ে বলল—না। বরং এসে আমাকে বাঁচালি। ঐ ভ্যাম্পটার কাছ থেকে খানিকক্ষণ সরে থাকতে পারছি।

গগন চুপ করে থাকে। এ প্রসঙ্গটা কটু। না মন্তব্য করাই ভাল।

ছটকু বলল—এবার তোর কথা বল।

গগন কোনো ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করে না। ও জিনিসটাই তার নেই। যা করে বা বলে তা ভেবেচিন্তে গুছিয়ে। তাই খুব আস্তে আস্তে সে ঘটনাটা ছটকুর কাছে ভাঙতে লাগল।

খুব বেশী সময় লাগল না। মিনিট কুড়ি বড় জোর। ঘটনা তো বেশী নয়।

ছটকু যতক্ষণ শুনছিল ততক্ষণ তার দিকে তাকায়নি, মাথা নীচু করে ছিল। গগন থামতেই চোখ তুলে বলল—সব বলা হয়ে গেল? কিছু বাদ যায়নি তো!

—না। গগন বলে।

ছটকু মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে বলে—ঘটনার দিন খুনের সময়ে তুই কোথায় ছিলি?

গগন এটা ভেবে দেখেনি। তাই তো! কোথায় ছিল? অনেক ভেবে বলল—সন্ধ্যের একটু পরে জিমনাসিয়ামে ছিলাম।

—আর তার আগে?

—একটু বোধ হয় কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম বাজারে।

—কোন্ বাজারে?

গগন একটু চমক খেয়ে বলল—সাঁঝবাজার।

—সেটা তো স্পটের কাছেই।

গগনের গলা হঠাৎ শুকনো লাগছিল। নাড়ীর গতি বাড়ল হঠাৎ। সে কেমন ভ্যাবলার মতো বলল—হ্যাঁ।

ছটকু একটু চিং হয়ে আবার পাইপ ধরিয়ে বলে—আবার ভাল করে ভেবে ছাখ। কিছু একটা লুকোচ্ছিস।

—না না! গগন প্রায় আঁৎকে ওঠে। আর তার পরেই নির্জীব হয়ে যায়।

—বলে ফেল গগন। ছটকু ছাদের দিকে চেয়ে বলে।

ঠাণ্ডা ঘরে হঠাৎ আরো ঠাণ্ডা হয়ে যায় গগন। উদ্‌ভ্রান্ত বোধ

করে। বেগমের কথা সে ছটকুকে বলেনি। নিজের চরিত্র-দোষের কথা কেই বা কবুল করতে যায় আগবাড়িয়ে।

গগন কথা বলে না।

ছটকু পাইপ পরিষ্কার করতে করতে সম্পূর্ণ অন্য এক প্রসঙ্গ তুলে বলে—তুই তো জানিস না, আমার হাতে এখন কোনো কাজ নেই। মানে বাবা আমাকে কোনো কাজ দিচ্ছে না, মোর অর লেস তার একটা ধারণা হয়েছে যে আমি খুব অপদার্থ, বউয়ের সঙ্গে ইচ্ছে করেই গোলমাল করছি। ফলে বাড়িতে এখন দারুণ অশান্তি, লীনা নাকি টের পেয়েছে যে আমি একজন বিগতযৌবনা ফিলম-অ্যাকট্রেসের সঙ্গে শোয়াবসা করে থাকি। বাড়িতে বলেওছে সেকথা।

গগন নড়ে বসে। সে সাহস পাচ্ছে।

পাইপে তামাক ভরে জ্বালিয়ে ছটকু বলে—কথাটা মিথ্যেও নয়। তবে কিনা সে মহিলাটির যৌবন এখনো যায়নি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, শরীরের সম্পর্ক হয়নি এমন নয়, তবে কোনো সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচ-মেন্ট নেই। প্রেম-ট্রেম তো নয়ই। জাস্ট এ সর্ট অফ ফ্রেণ্ডশীপ। উঁচু সমাজে খুব চলে এটা, নাক সিঁটকোবার কিছু নেই, তাছাড়া বিয়ের পর মেয়েটির সঙ্গে দেখা প্রায় হয়ইনি। কিন্তু লীনা সেটাকে ঘুলিয়ে তুলছে।

—মেয়েটি কে?

—তুই চিনবি না, পঞ্চাশের ডিকেডে ফিলমে নামত। তেমন নাম-টাম করেনি। যা বলছিলাম, এসব কারণে আমার অবস্থাটা খুব খারাপ ফ্যামিলিতে। অলমোস্ট জবলেস ভ্যাগাবণ্ড, বউয়ের সঙ্গে শুই না। কিছুদিন মদ খাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওটা আমার স্যুট করে না একদম। বদহজম আর অ্যাসিড হয়ে অসম্ভব কষ্ট পাই। একজন বন্ধু জুটে কিছুদিন ড্রাগের নেশা করাল, খুব জমেছিল নেশাটা, বাবা নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়ে কিওর করাল। শেষ পর্যন্ত দেখলাম সুকুমার রায়ের সেই অবস্থা। হাতে রইল পেন্সিল।

বউয়ের সঙ্গে বনে না, বাপের সঙ্গে বনে না, মদের সঙ্গে বা ড্রাগের সঙ্গেও বনে না, কিছু নিয়ে থাকতে তো হবে।

বলে পাইপটা দেখিয়ে একটু হেসে চোখ টিপে বলে—এর মধ্যে যে টোব্যাকো রয়েছে, তাতে আছে অল্প গাঁজার মিশেল। গন্ধ পাচ্ছিস না ?

—না।

—কিন্তু আছে। আজকাল নানারকম নেশার এক্সপেরিমেণ্ট করি। সময় কাটে না! বুঝলি গগন ?

—বুঝলাম।

—তাই বলছিলাম তোর সব কথা আমাকে বল। তোকে নিয়ে আর তোর প্রবলেম নিয়ে একটু ভাবি। সময় কাটবে।

ছটকুকে গগন খুব চেনে। ও কুকুরের মতো বিশ্বাসী, কমপিউ-টারের মতো মাথা ওর। ছটকুকে বকসিং অভ্যাস করতে দেখেছে গগন। অজস্র মার খেত, মারত। রোখ ছিল সাঙ্ঘাতিক। ভীতু নয়, লোভী নয়। ওকে বিশ্বাস করতে বাধা নেই।

কিন্তু গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হাই তুলে বলল—তোকে আমার সব কথা বললাম কেন জানিস ? যাতে আমাকে তোর অবিশ্বাস না হয়। বিশ্বাস কর, আমার তোকে হেলপ করতে ইচ্ছে করছে।

গগন চোখ বুজে এক দমকায় বলে উঠল—ফলির মায়ের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল।

ঠাণ্ডা মুখে কথাটা শুনল ছটকু। একটু সময় ছাড় দিয়ে ঠাণ্ডা গলাতেই প্রশ্ন করে—ফলির মা কে ?

—ওঃ, সে একজন সোসাইটি লেডি। গগন আবার চোখ বুজে বলে।

—সোসাইটি লেডি ? তার সঙ্গে তোর দেখা হল কোথায় ?

—হয়ে গেল।

—হয়ে গেল মানে? তোর কাছ থেকে সে পাবে কী? সোসাইটি লেডি বলতে আমরা অন্যরকম বুঝি। একটু নাক-উঁচু স্বভাবের, সিউডো [illegible]ট-ওলা মহিলা। এরা জেনারেলি হাই ফ্যামিলির মেয়ে। যেমনটা একদিন লীনা হবে।

গগন নিজের হাতের ঘাম প্যান্টে মুছে বলে—এও অনেকটা সেরকম, তবে হাই ফ্যামিলি নয়, স্বামী সামান্য চাকরি করে।

—খদ্দের ধরে পয়সা নেয় নাকি?

—না বোধ হয়। তবে প্রেজেন্টেশন নেয়, সুবিধে আদায় করে, ধারও নেয়।

ছটকু হেসে বলে—তাহলে হাফ-গেরস্ত বল। ওসব মেয়েকে আমরা তাই বলি। সোসাইটি লেডি অন্য রকম, যদিও জাত একই। তোর কাছ থেকে কি নিত?

—কী নেবে? আমার আয় তো জানিস। চাইলেও দিতে পারতাম না। তবে চায়নি।

—শুধু শরীর?

—শুধু তাই। গগন লজ্জা পেয়ে বলে।

ছটকু চিন্তিত হয়ে বলে—ও সব মেয়ে তো আর ভাল তেজী পুরুষ বড় একটা পায় না। যারা আসে তারা প্রায়ই বুড়ো-হাবড়া কামুক, নইলে নভিস। তাই তেমন পুরুষ পেলে বিনা পয়সায় নেয়। নিতান্ত শরীরের স্বার্থে। তারপর কী হল?

—কিছুদিন পর ফলির মা বেগম আমাকে রিজেক্ট করে দেয়। গেলে আর খুশী হত না আগের মতো। আমি কিন্তু ওকে দারুন ভাল-বেসে ফেলেছিলাম।

—বুঝেছি।

—মনে মনে বেগমের জন্য খুব ছট্‌ফট করেছি বহুদিন। এখনো করি। যাই হোক, ফলি যেদিন মারা যায় তার দিন দুই আগে বেগমের একটা চিঠি পাই। তাতে ও লিখেছিল, একটা বিশেষ দিনে

সন্তোষপুরের একটা ঠিকানায় গিয়ে যেন দেখা করি ওর সঙ্গে। খুব জরুরী কথা, যেদিনের কথা লিখেছিল সেটা ছিল খুনের তারিখটাই।

—বেগমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—না। সে ঠিকানায় গিয়ে আমি বুড়বাক। সেখানে বউ-বাচ্চা নিয়ে এক প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার দিব্যি সংসার করছে। বেগমের কথা তারা জানে না।

—বেগমের হাতের লেখা তুই চিনিস?

—না।

—তবে বুঝলি কী করে যে বেগম লিখেছিল?

—অবিশ্বাসের তো কিছু ছিল না।

—যাক গে। তারপর কি হল?

—কী হবে? ওকে না পেয়ে ফিরে এলাম।

—কারো সঙ্গে দেখা হয়নি আসবার পথে?

গগন চুপ করে থাকে। বলা উচিত হবে কি? অথচ না বলেই বা গগন পারে কী করে? এতদূর এগিয়ে আবার পিছোবে?

গগন চোখ বুজে বলে—ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

এ কথায় ছটকুও যেন চমকে যায়। তবে গলার স্বরটা খুবই ঠাণ্ডা রেখে বলে—কোথায়?

—বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছিল। আমাকে দেখে উঠে আসে।

—কী কথা হল?

—কথা যা হয়েছিল তা মিঠে বা মোলায়েম নয়। একসময়ে সে আমাকে একলব্যের মতো ভক্তি করত, কথায় জান দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সেদিন সে হুট করে বেরিয়ে এসে আমার রাস্তা আটকে বলল—গগনদা, আপনার সঙ্গে কথা আছে। তার মুখচোখ দেখে আর গলার স্বর শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম। একটু যে ভয়ও খাইনি তা নয়। বেজায়গায় হঠাৎ ওরকম সিচুয়েশন হলে যা হয়। আমতা

আমতা করছিলাম, কারণ মনে পাপ। আমি এসেছিলাম ওর মার চিঠি পেয়ে দেখা করতে, সেটা তো ভুলতে পারছি না। ও আমাকে একটা দোকানঘরের পিছনে নিয়ে গিয়ে সোজাসুজি বলল—আমার মার সঙ্গে আপনার খারাপ রিলেশন আছে আমি জানি, আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। ঠিক এ ভাষায় বলেনি, তবে সেনস্‌টা এই·রকমই। তখন আর গগনদা বলে ডাকছিল না।

—মারধর করার চেষ্টা করেছিল?

—হ্যাঁ, দু-চারটে কথা চালাচালি হল। আমি দুম করে বলে বসলাম—বেগম কি আমার জন্যই নষ্ট? ওর তো অনেক খদ্দের, খোঁজ নিয়ে দেখগে। আমি আবার মিথ্যে কথাটথা বানিয়ে গুছিয়ে বলতে পারি না। বেগমের সঙ্গে আমার রিলেশনটা যে অন্যরকম যে কোনো লোক হলে তা দিব্যি বানিয়ে-ছানিয়ে বলত। আমি পারি নি। যা হোক, একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেমক্কা একটা পিস্তল বের করল পকেট থেকে। ওর চোখ দুটো তখন পুরো খুনীর। দোকানের পিছনের সেই জায়গাটা আবছা অন্ধকার মতো। সেই আবছায়ায় দু-চারজন যে গা-ঢাকা দিয়ে দেখছে তা বুঝতে পারছিলাম। তাদেরই একজন এসময়ে বলে উঠল—ফলি, চালাস না। স্টিল ভরে দে। ফলি তাতে দমেনি। পিস্তলটা তুলে বলল—তোমাকে এইখানে নাকখৎ দিতে হবে, থুতু চাটবে, জুতো কামড়ে ঘুরবে, তারপর তোমার পাছায় লাথ মারব। বুঝলাম খুন না করলেও ফলি এবং তার বন্ধুরা আমাকে বেদম পেটাবে। তার আগে নানারকম ভাবে অপমান করবে। ফলি আর আগের ফলি নেই।

—তুই কি করলি?

—খুব ভয় খেয়ে গিয়েছিলাম। অতটা ভয় না খেলে আমি ফলিকে মারতাম না।

—মেরেছিলি?

গগন অবাক হয়ে বলে—তুই কী বলিস, মারা উচিত হয়নি?

ছটকু দাঁতে দাঁত চেপে বলে—তা বলিনি। শুধু জানতে চাইছি।

গগন একটু অন্যমনে চেয়ে থেকে বলে—আমিও ভেবে দেখেছি মারাটা উচিত হয়েছে কিনা। কিন্তু আমার আর কী করার ছিল? বুঝি যে মায়ের নষ্টামির জন্য ছেলের অপমান বোধ হতেই পারে। কিন্তু ফলির মাকে তো আমি নষ্ট করিনি, কোনদিনই আমি মেয়েমানুষের পিছনে ঘুরি না, কিন্তু বেগম আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল। তার জন্য ফলি খামোখা আমার উপর শোধ নেবে, আর আমি দাঁড়িয়ে মার খাবো নাকি? তাছাড়া তখন প্রাণের ভয়।

—কী করলি?

—ফলি চোখেই দেখতে পেল না কী ওর মুখে গিয়ে লাগল, খুব কুইক ঝেড়েছিলাম ঘুঁষিটা। ফলি অ্যাই জোয়ান। সহজে কাবু হওয়ার মাল নয়, তার ওপর হাতে পিস্তল ছিল। কাজেই সে ছিল নিশ্চিন্ত। আশেপাশে বন্ধু-বান্ধবও রয়েছে। ভয় কি? তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় আচমকা ঘুঁষি খেয়েই টলে পড়ল সামারসল্ট হয়ে। আমি তুই লাফে বেরিয়ে বাজার ধরে দৌড়ে পালিয়ে আসি।

—তাহলে তোকে অনেকে দেখেছিল তখন।

—দেখাই স্বাভাবিক। দোকানে লোক ছিল, বাজার তো তখন গিজগিজ করছে।

—কেউ তোর পিছু নেয়নি?

—না।

—তারপর কী করলি?

—সোজা জিমনাসিয়ামে চলে যাই।

ছটকু আবার পাইপ ভরে বলে—রিকসাওলা কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল গগন?

গগন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর যেন ছিপি খুলে সোডার বোতলের গ্যাস বের করে দেয়, আস্তে করে বলে—জানি না।

এমনিতেই শব্দহীন ঘর। তার ওপর যেন আরো ভারী এক নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ছটকু গগনের চোখে চোখ রেখে চোখাদৃষ্টিতে কী একটু দেখে নেয়। তারপর গম্ভীর মুখেই বলে—ঠিক বলছিস?

গগন ভাবছে—ছটকু শালা কি আমাকেই সন্দেহ করছে? করারই কথা অবশ্য। ঘটনা যা ঘটেছে তার সব কিছুই আঙুল তুলে তাকেই দেখাচ্ছে।

গগন ছটকুর চোখের দিকে আর না তাকিয়ে বলে—আমি টাকা দিইনি। তবে ঝামেলা এড়ানোর জন্য হয়তো কখনো কালুকে টাকাটা দেবো। যদি তাতে মেটে!

—মিটবে না। ছটকু বলে।

গগন বলে—বিশ্বাস কর, ফলিকে একটা ঘুঁষি মারা ছাড়া আর কিছু করিনি। এক ঘুঁষিতে মরার ছেলে ফলি নয়। পরে আর কেউ লাইনের ধারে ফলিকে মারে।

ছটকু খুব বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—ত্যাখ গগন, যে মানুষ জীবনে একটাও খুন করেছে তাকে চোখে দেখেই আমি চিনতে পারি। আমার একটা অদ্ভুত ইনস্টিংট আছে। এ ব্যাপারে কখনো ভুল হয় না আমার। তুই যদিও কখনো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় কাউকে খুন করে থাকিস, তবে তোকে প্রথম দেখেই বুঝতে পারতাম। কিন্তু এটা খুবই সত্যি কথা যে তোর চেহারায় খুনীর সেই অবশ্যম্ভাবী ছাপটা নেই।

গগন নিশ্চিন্ত হল কি? বলা যায় না, তবে সে এবার কিছুক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে দম নিল। বলল—আমি যে খুন করিনি তা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে। কিন্তু লোকে কি তা বিশ্বাস করবে? সকলের তো আর তোর মতো ইনস্টিংট নেই!

ছটকু একটু হাসে। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে—ফলি যে লাইফ লীড করত তাতে যে কোনো সময়ই তার খুন হওয়ার বিপদ

ছিল। এ নিয়ে ভাবিস না। কাল থেকে আমি তোর ব্যাপারটা নিয়ে অ্যাকশনে নামব। সকালে ক'টায় উঠিস ?

—খুব ভোরে। চারটে সাড়ে চারটে।

ছটকু একটু ভেবে বলে—আমি উঠি ছ'টায়, কিন্তু কাল থেকে আমি তোর মতো সকালে উঠবো। মনে হচ্ছে, একটু একসারসাইজ দরকার। সকালে উঠে দৌড়োবি !

—নয় কেন ?

—দৌড়ের পর দুজনে একটু কসরৎও করা যাবে, কী বলিস ?

গগন হাসে। বলে—ঠিক আছে।

॥ নয় ॥

অনেক রাত পর্যন্ত বেগম অঝোরে কেঁদেছে পুত্রশোকে। নরেশ পাড়ার ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে আনে। বড় ডোজের সেডেটিভ ইনজেকশন দেওয়ার পর বেগম ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক বেলা অবধি সে ওঠেনি।

নরেশ সারারাত ঘুমোয়নি। কখনো কেঁদেছে, কখনো পায়চারি করেছে ঘরে বা ছাদে। শোভা তার তীব্র জ্বালাধরা দুখানা চোখে দেখেছে সবই, সেও ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝে বিছানায় গেছে, আবার উঠেছে, দেখেছে, তারপর আবার শুয়েছে। বিছানা খুব তেতে যাচ্ছিল বার বার। কী এক জ্বালায় তার নিজের শরীর আর শ্বাস এত গরম যে বিছানায় শরীর রাখতে পারছে না। সোফা কৌচে বসতে পারে না। নরেশের সঙ্গে মুখোমুখি কথাও হচ্ছিল না তার। দুজনেই দুজনকে এড়াচ্ছে।

মাঝে মাঝে শোভা গিয়ে ঘুমন্ত বেগমকে দেখেছে। চোখের কোলে এখনো জল বেগমের, চুল উসকোখুসকো, একটু বুড়োটে হয়ে

গেছে মুখের শ্রী, তবু এখনো বেগম হাড়জ্বালানি সুন্দরী। শোভার ইচ্ছে করে ওকে বিষ দিয়ে মারতে। চিরকাল খোলাখুলি পুরুষদের নাচাল বেগম। কত [illegible]ষের স্বামী কেড়ে নিয়ে সর্বনাশ করেছে। নরেশ হল বেগমের ভেড়ার পালের একজন।

শেষরাতে যখন আকাশের তারা ফিকে হচ্ছে তখন শোভা আর থাকতে না পেরে ছাদের সিঁড়িতে গিয়ে নরেশকে ধরল।

—তুমি ভেবোছোটা কী, অ্যাঁ ?

নরেশ তার দিকে খুব আনমনে চেয়ে রইল। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল—তুমি বিছানায় যাও।

—কেন যাবো ? তোমার হুকুমে ?

—আমার মন ভাল নেই। একা থাকতে দাও।

—মন ভাল নেই কেন ? ফলির জন্য ?

নরেশ বলে—শোভা, তুমি মানুষ নও ? ফলি কি তোমার কেউ নয় ?

শোভা খুব খনখনে পেত্নীর হাসি হেসে বলে—ওমা! সে কথা কি বলতে আছে ? ফলি যে আমার বুকের ধন, কোলের মানিক! লজ্জা করে না তোমার ?

—কী বলছো ?

—কী বলছি বুঝতে পারছ না, ন্যাকা!

—পারছি না।

—আমি জানতে চাই শালীর ছেলের জন্য তোমার অত ভেঙে পড়ার কী ? দয়া করে রহস্যটা বলবে, নাকি আমার মুখ থেকে শুনবে ?

নরেশ গুম হয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—এ সময়ে রাগারাগি থাক, তুমি শুতে যাও।

—আমি শোবো না। সত্যি কথাটা তোমার মুখ থেকে আগে শুনি, তারপর কী করব না করব তা আমি জানি।

—আমার কিছু বলার নেই।

—ফলি কার ছেলে, তাও ঠিক জানো না ?

নরেশ চুপ করে থাকে।

শোভা আবার সেই পেত্নীর হাসি হেসে মোটা শরীরে হিল্লোল তুলে বলে—আমার গর্ভে হয়নি বটে কিন্তু বেগম হারামজাদার পেটে ফলি এসেছিল কী করে তা আজ স্বীকার হও না কেন ?

—তুমি যাবে ?

জবাবটা এল অপ্রত্যাশিত একটা প্রচণ্ড চড় হয়ে।

মোটা হলেও শোভার হাজারটা ব্যামো। হার্ট খারাপ, প্রেসার বেশী, মেয়েমানুষী রোগও অনেক, তাছাড়া আরামে আয়েসে থেকে শরীর অকেজো। চড়টা লাগতেই চার ধাপ সিঁড়ি টপকে অত বড় লাশটা পড়ল সিঁড়ির মোড় ঘোরার চাতালে। বাড়ি কেঁপে গেল তার পড়ার শব্দে।

॥ দশ ॥

বাড়িতে ঢুকেই কালু বুঝতে পেরেছিল, জায়গাটা গরম আছে। তার মতো লোকের ঘরে ঢুকে মস্তানরা যখন হুটোপাটি করে গেছে তখন বুঝতে হবে কেস খারাপ।

মা প্রথম দিকে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, একটু বাদে দম ফুরিয়ে ঘ্যাজর-ঘ্যাজর করতে লাগল।

সেদিকে মোটে কানই দিল না কালু। বলল—ফালতু বাত ছেড়ে কাজের কথাটা বলে লে দিকি। কী হয়েছে কী ?

—তোকে যমে নেয় না কেন বলবি ?

—অরুচি বলে নেয় না। কারা এসে হাল্লাক করে গেছে ?

—সে গিয়ে তোর পেয়ারের লোকদের জিজ্ঞেস কর গে। আমি

কি সবাইকে চিনে রেখেছি ? নাহ'ক হাবুকে আর ভূতুকে ধরে এই মার কি সেই মার ! কেবল জিজ্ঞেস করে কালু কোথা বল। আমি ঠেকাতে গেলাম তো আমাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কনুই ছড়ে এখনো রক্ত পড়ছে।

—হাবু ভূতু কই ?

—তারা থানায় গেছে।

কালুর মাথাটা ঠিক নেই। বড্ড ঘোঁট পাকাচ্ছে চারদিকে। বলল—কাউকে চিনতে পারিসনি ?

—হাবু বলছিল একজন নাকি বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। সে সুরেন খাঁড়া না কে যেন !

কালু সময় নষ্ট করল না। সোজা উঠোনে গিয়ে কচুগাছের গোড়ার মাটি খামচে তুলে ফেলল। তলায় একটা প্লাস্টিকের খামে তার টাকা। সেটা তুলে পকেটে পুরে সে গিয়ে মাকে বলে—আমি পাতলা হচ্ছি। খুঁজিস না। বাড়িতে থাকলে শালারা আবার আসবে।

—কী করেছিস বল ! নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

—চেঁচাস না। জানাজানি হলে আমিও যাবো, তুইও যাবি।

ভয় পেয়ে মা চুপ করে যায়।

কালু অপথ-কুপথ ঘুরে স্টেশনে চলে আসে। বিশে গনগনে আঁচে বেগুনী ভাজছে। কালু গিয়ে সোজা সেখানে বসে পড়ে বলে—গাড্ডায় পড়ে গেলাম।

বিশে এক খদ্দেরকে বিদেয় করে বলে—আজ মাল খাওয়াবি বলেছিলি।

—মাইরি খাওয়াবো। আমাকে দু-একদিন থাকতে দিবি ?

বিশে হেসে বলে—থাকার জন্য স্টেশন আছে।

কালু মাথা নেড়ে বলে—তা ঠিক।

—গাড্ডা কী ?

—বাড়িতে হামলা করেছে শালারা।

—কারা ?

—আছে ।

রামরতন রিকশাওয়ালা চপ কিনতে এসে কালুকে দেখে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে বলে—অ্যাই শালা! তোকে নাকি শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়েছে ?

কালুর মেজাজ ভাল নেই। উঠে সটাং করে এক চড় কষাল রামরতনের গালে। বলল—জল ভরে দেব শালা। গেলবারে গুপ্তর দোকানের মাল সরিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ি ঘোরোনি ?

রামরতন বেশী ঘাঁটাল না। কালু একা নয়, বিশে আছে। বিশে মহা মারকুট্টা ছোকরা। স্টেশনের ভিখিরিদের দঙ্গলটা দরকার মতো বিশের পক্ষ নেয়। বিশে ওদের ভাজা বেসনের কুঁড়ো আর নিউড়োনো মুড়ি দিয়ে হাতে রাখে। তাই রামরতন গালে হাত বুলিয়ে বলল—খচছিস কেন? আমি শালা ভাল কথা বলতে গেলাম!

কালু আর বসল না। বিশেকে বলল—আমি সাঁঝের পর আসব।

বিশে মাথা নাড়ে।

কালু স্টেশন রোড ধরে সোজা হাঁটা দেয়।

ঘুরেফিরে কোথাও যাওয়ার নেই দেখে সন্তুদের বাড়ির কাছে চলে আসে কালু। এসে দেখে নরেশবাবুদের বাড়ির সামনে জটলা হচ্ছে। দোতলা থেকে নরেশের মোটা গিন্নীর চেঁচানি আসছে—সব জানি, সব জানি। ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলব তোমার চরিত্রের কথা।

সন্তু নীচের তলায় ছিল। কালুর এক ডাকে বেরিয়ে এসে বলল—চল। তোর সঙ্গে কথা আছে।

দুজনে সিংহীদের বাগানে ঢুকে পড়ে।

সবেদা গাছটা ন্যাড়া করে ফল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে পাড়ার ছেলেরা। সেই গাছের তলায় বসে সন্তু গম্ভীর মুখে বলে—তুই এরকম ডে-লাইটে ঘুরে বেড়াচ্ছিস!

—তাতে তোর বাবার কি?

—মুখ খারাপ করিস না কালু।

কালু হেসে বলে—রং লিস না সন্তু। আমি কাউকে ভয় খাই না।

সন্তু কালুর দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বলে—যখন প্যাঁদানি খাবি তখন বুঝবি।

কালু বলল—ছোড় বে।

সন্তু চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—ঠিক আছে; তোর ভালর জন্যই বলছিলাম।

—আমার ভাল নিয়ে তোর মত ভদ্দরলোকদের ভাবতে হবে না। আগে বল কী বলতে চেয়েছিলি!

সন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—তুই পুলিসকে গগনদার নাম বলেছিস?

—আমি বলব কেন?

—তবে কে বলেছে?

—তার আমি কী জানি? গগনদাকে ফাঁসিয়ে আমার কী লাভ?

—কিন্তু সবাই জানে তুই গগনদার নাম বলেছিস। গগনদা কাল পালিয়ে গেছে।

কালু এটা জানত না। একটু থমকে গিয়ে একগাল হেসে বলে—লাগ ভেলকি লাগ। খুব জমে গেল মাইরি।

সন্তু একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

হঠাৎ কালু মুখ গম্ভীর করে বলল—সুরেন শালাকে আমার বাড়ি চেনাল কে বল তো?

—তার আমি কি জানি!

—জানিস না ?

—আমি জানব কি করে ?

—আমার বাড়িতে সুরেন গিয়ে হামলা করেছে কেন তা জানিস ?

সন্তু স্পষ্টই অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু খুব তেজের গলায় বলে—ওসব আমার জানার কথা নয়।

—সুরেন আমার কাছে কী চায় তাও জানিস না ?

—না।

—এর আগেও সুরেন আমাকে একবার মেরেছে। শালা জানে না, কালু রিকশাওয়ালা হলেও মেড়া নয়। শালার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

—ওসব আমাকে বলছিস কেন ?

আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ সুরেনকে আমার বাড়ির পাত্তা লাগিয়েছে। নইলে আমার বাড়ি চেনার কথা ওর নয়।

—আমি ঠিকানা দিইনি।

কালু খুব হীন চোখে সন্তুর দিকে চেয়ে বলে—কাল তুই আমাকে ছোরা চমকেছিলি, মনে আছে ?

সন্তু জবাব দেয় না। অন্যদিকে চেয়ে থাকে।

কালু বলে—আমি কিছু ভুলি না।

—সে তোকে মারার জন্য নয়। ভয় দেখানোর জন্য।

কালু হাত বাড়িয়ে বলে—ছুরিটা দেখি।

—কাছে নেই।

কালু একেবারে আচমকা লাফিয়ে উঠে পটাং করে একটা লাথি লাগাল সন্তুর থুতনিতে। লাথিটা তেমন জোরালো হল না। কালুর শরীরে এখন আর তত তেজ বল নেই। সন্তু শালা ভাল খায়দায়, গগনের কাছে ব্যায়াম শেখে। শক্ত জান, তবু আচমকা লাথি খেয়ে মুখ চেপে মাটি ধরে নিল।

কালু সময় নষ্ট করে না। পড়ে-থাকা সন্তুর প্যাণ্টের পকেটে

পকেটে হাত চালিয়ে মালটা বের করে ফেলে। বিলিতি ছুরি, কল টিপলে ছ ইঞ্চি ইস্পাত বেরিয়ে আসে পটাং করে।

সন্তু যখন উঠল তখন কালুর হাতে ফলাটা জমে গেছে। চকচক করছে রোদে। কালু বলল—দেখ শালা, আমার জানের পরোয়া নেই। দরকার হলে আমি লাশ ফেলব। ঠিক করে বল, সুরেনকে কে আমার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে।

দাঁত বসে গিয়ে সন্তুর ঠোঁট ফেটে হাঁ হয়ে আছে। অঝোর রক্ত। হাতের পিঠে ক্ষতস্থান মুছে নিজের রক্ত দেখল সন্তু। তারপর খুব ঠাণ্ডা চোখে চাইল কালুর দিকে।

কালু কখনো ছুরি চালায় নি, সন্তু জানে। এও জানে, কালুর শরীরে কিছু নেই। তবে রোখ আছে।

হিসেব করতে কয়েক পলক সময় নিল সন্তু। গগনের কাছে সে বিস্তর প্যাঁচ শিখেছে।

সন্তু কী করল তা চোখে ভাল দেখতেও পেল না কালু। কিন্তু হঠাৎ টের পেল তার ছুরির হাতটা মুচড়ে ধরে সন্তু তাকে উপুড় করে ফেলেছে। পিঠে হাঁটু চেপে বসিয়ে মাথাটা ঠুকবার তাল করছে মাটিতে।

কালুর লাগে না। মারধর সে বিস্তর খেয়েছে। প্রায়ই খায়। মুহূর্তে সে হাঁটুতে ভর দিয়ে পটাং করে শরীরটা ছুঁড়ে দিল উল্টোবাগে। সন্তু ছিটকে গেল।

দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে ছুটে আসে পরস্পরের দিকে। কালুর হাতে আধলা ইঁট, সন্তুর হাতে ছুরি।

খুব ভোরেই উঠে পড়তে হল গগনকে। ভোরে ওঠা অভ্যাস, তার ওপর এখন প্রবল দুশ্চিন্তা চলছে।

বাথরুমের কাজ শেষ করে এসে যখন বাসী বিছানাটা নিজেই গোছাচ্ছে, তখন ছটকুর ঘর থেকে অ্যালার্ম বাজার শব্দ এল।

মিনিট পনোরোর মধ্যেই ছটকু ফিটফাট হয়ে এসে গগনের দরজায় টোকা মেরে ডাকে—গগ, উঠেছিস ?

—উঠেছি।

—চল।

গগনের মন ভাল নেই। সকালে উঠে শরীর রক্ষার জন্য দৌড়ানো বা ব্যায়াম করার মতো মন এখন তার নয়। তবু ছটকুর আগ্রহে যেতে হল।

বড়লোকী সব ব্যাপার। ছটকু তার ফিয়াট গাড়ি চালিয়ে ময়দানে এল। ঘড়িতে সোয়া চারটে। ভিকটোরিয়ার সামনে গাড়ি রেখে দুই বন্ধুতে ধীরলয়ে দীর্ঘ দৌড় শুরু করে। পাশাপাশি।

গগন টের পায়, ছটকু নেশাভাঙ যাই করুক এখনো ওর প্রচণ্ড দম। প্রায় মাইল দুই দৌড়ের পর বরং গগনের কিছু হাঁফ ধরেছে, কিন্তু ছটকু একদম ফিট।

বাড়িতে ফিরে ছটকু গগনকে নিয়ে গেল তার জিমনাসিয়ামে। ছোটর মধ্যে এত ভাল জিমনাসিয়াম গগন চোখেও দেখেনি। প্রত্যেকটা যন্ত্রপাতি ঝা-চকচকে নতুন আর দামী। বেশীর ভাগই বিদেশ থেকে আনা।

ছটকু বলে—এসব পড়েই থাকে বেশীর ভাগ। আমি মাঝে মাঝে খেয়াল হলে ব্যায়াম করি।

দুজনে প্রায় পৌনে এক ঘন্টা নীরবে নিখুঁত ব্যায়াম করে যায়। গগন নিজে প্রশিক্ষক, কাজেই ব্যায়ামের খুঁটিনাটি সব তার জানা। কিন্তু সেও অবাক হয়ে যায় ছটকুর নিখুঁত ব্যায়াম দেখে। কোথাও কোনো খাঁকতি নেই।

ব্যায়ামের পর দুজনেই গ্লাভস পরে কিছু সময় ঘুষোঘুষি করে। ছটকু খুবই ভালো লড়ে। ওর বাঁ হাতের ছোবল বিষে ভরা। গগন দুটো ভূতুড়ে ঘুঁষি খেয়ে গেল ছটকুর হাতে। বলল—তুই এখনো একটি বিচ্ছু আছিস। লড়া ছেড়ে দিলি কেন?

—আরে দূর! লড়ে হবে কী?

—কিন্তু এখনো তোর ঘুঁষিতে অনেক ব্যাপার আছে।

ছটকু গ্লাভস খুলে ফেলে উদাস মুখে বলে—কী জানিস! আসলে আমার জীবনটা তো হ্যাপী নয়। চারদিকটার ওপর আমার আক্রোশ। ঘরে একটা কালো সাপ পুষছি। কেউ আমাকে বোঝে না, আমার প্রতি কারো সিমপ্যাথি নেই। সেই সব দুঃখ, রাগ, আক্রোশ সব আমার ঘুঁষিতে বেরোয়।

গগন বুঝতে পারে। ছটকুর জন্য তার একটু মায়াও হয়। বড়লোকেরাও দুনিয়াতে সুখে থাকে না তাহলে!

গগনের চিন্তা ভাতকাপড় নিয়ে। অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় তার দিন ক্ষয় হয় রোজ। সে লড়াই ছটকুর নেই। তবু ভগবান ওকেও তো সুখ দেননি।

এলাহি জলখাবারের আয়োজন টেবিলে সাজানো। বেশীর ভাগই ইংলিশ খানা। হ্যাম অ্যাণ্ড এগ, পরিজ, টোস্ট, ফল। গগন মাছমাংস খায় না বলে তার জন্য অনেকখানি ছানা দেওয়া হয়েছে। আর বাদামের সরবৎ।

গগন খুব বেশী খায় না। পেট ভার করে খাওয়া তার ভীষণ অপছন্দ। ছটকুও বেশী খেল না। সাজানো খাবারের অধিকাংশই পড়ে রইল।

ছটকু তার পাইপ ধরিয়ে বলে—তুই তো জুডো শিখছিলি, না ?

—হ্যাঁ।

—আমিও শিখেছিলাম লণ্ডনে।

—জানি।

—জুডো শেখার সময় যে শপথ করানো হয়, তা মনে আছে গগ ?

—আছে।

ছটকু হেসে বলে—নিতান্ত আত্মরক্ষার খাতিরে ছাড়া কাউকে আঘাত করা যাবে না।

—জানি।

—আমার সে নিয়মটা প্রায়ই ভাঙতে ইচ্ছে করে। বুঝলি! আজকাল মাঝে মাঝে আমার মাথা ভিস্যুভিয়াস হয়ে যায়।

গগন ব্যাপারটা বুঝল না। চুপ করে রইল।

সামু খাবার টেবিল পরিষ্কার করছে। আর একজন উর্দি পরা লোক কফির ট্রে নিয়ে এল।

গগন কফি বা চা খায় না। ছটকু কালো কফি কাপে ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলে—কাল রাতে আই হ্যাড অ্যানাদার এনকাউণ্টার উইথ হার।

গগন চোখ নামিয়ে নেয়। ছটকু এবং তার বউয়ের প্রসঙ্গটা বড় অপ্রীতিকর বলে তার মনে হয়। সে লক্ষ্য করেছে, সকালে জলখাবারের টেবিলে ছটকুর বউ লীনা আসেনি। কিন্তু ভদ্রতায় বলে, আসা উচিত ছিল। তবে গগন নিজেকে খুব সামান্য মানুষ বলে মনে করে, তাই তার প্রতি কেউ তেমন সৌজন্য না দেখালেও সে কিছু মনে করে না।

কিন্তু ছটকুর বোধহয় ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। কফি আর পাইপে কিছুক্ষণ ডুবে থেকে সে হঠাৎ বলল—ছুনিয়ার কাউকেই ও

মানুষ বলে মনে করে না। কাল রাতে আই হ্যাড টু বিট হার।

গগন ব্যথিত হয়ে মুখ তোলে। বলে—সে কি রে! মারলি?

—মারতে হল। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি। আই অ্যাম এ ফলেন গায়।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে—আফটার অল মেয়েমানুষ তো!

—তুই মেয়েমানুষ চিনিস না গগ। চিনলে অত দয়া হত না তোর। মেয়েমানুষকে যারা অবলা বলে তারা অনভিজ্ঞ। ওদের মতো এত নিষ্ঠুর আর নেই।

গগন রাত্রিবেলা কোনো সাড়াশব্দ পায়নি। তার ঘুম খুব চটকা। তার ওপর গতকাল সে ভাল ঘুমোয়নি। তবে কি ছটকুর ঘরটাও সাউণ্ড প্রুফ করা? কিন্তু তাহলে সকালে অ্যালার্মের আওয়াজ এল কী করে?

ছটকু অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল—কিন্তু মেরেও লাভ হয় না। লীনা যেমন-কে-তেমনই থেকে যায়। তেমনি কোল্ড-ব্লাডেড, ক্রুয়েল, সেলফিস, অ্যামবিশাস।

সামু সবই শুনছে। গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—চল। অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো ছাড়া এখন আমার আর পথ নেই।

ছটকুর ফিয়াট গাড়িটা যখন প্রকাশ্য দিনের আলোয় পাড়ায় ঢুকছে তখন গগনের বুকটা একটু বেশী ধকধক করছিল। গলা শুকিয়ে গেছে।

ছটকু গগনের গ্যারাজঘরের সামনেই গাড়িটা দাঁড় করাল। স্টিয়ারিঙে হাত রেখে গগনের দিকে ফিরে একটু হেসে বলল—দ্যাখ গগ, তুই আর আমি একসঙ্গে বিশটা লোকের মহড়া নিতে পারি। সুতরাং ঘাবড়াবি না। আমার মনে হয় না কেউ তোকে খামোখা ধরপাকড় করতে আসবে।

গগন গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল—তা নয়। তবে আমার লজ্জা করছে। তুই এখানে এলি কেন?

—এখান থেকেই কাজ শুরু করব বলে।

বেরোবার আগে ছটকু অনেকক্ষণ টেলিফোনে যাদবপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলেছে। নিজেদের প্রতিষ্ঠার জোরে ছটকু থানা-পুলিসের খাতির পায়। সকলের সঙ্গেই তার ভাল ভাবসাব।

টেলিফোনে কী কথা হয়েছে তা গগন শোনেনি। কথা বলার পর ছটকু তাকে সংক্ষেপে জানিয়েছেঃ যাদবপুর থানা থেকে যেটুকু জানবার জেনে গেছি। এখনো তোর কোনো ভয় নেই।

গগনের তবু ভয় যায় না।

বেলা বেশী হয়নি। দশটা বোধহয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ চারদিক পোড়াচ্ছে। ছোট্ট গাড়িটা এর মধ্যেই তেতে ভ্যাপসা হয়ে গেছে।

গগনকে একটা রোদ-চশমা ধার দিয়েছে ছটকু। নিজেও একটা পরেছে। ছদ্মবেশ খুবই সামান্য। তবু হয়তো লোকের চোখ থেকে কিছুটা আড়াল করা যাবে নিজেকে।

নরেশের বাড়ির ওপরতলা থেকে শোভার প্রচণ্ড গলার শব্দ আসছে। বোধহয় সে নরেশেরই শ্রাদ্ধ করছিলঃ মায়ের পেটের বোন না হাতি! ঢ্যামনা কোথাকার! কার হুকুমে তুমি ওকে কোলে করে এনে এ বাড়িতে তুলেছো? বাড়ি আমার নামে। জবাবে একজন পুরুষ বোধহয় কিছু বলল।

শোভার গলা তুঙ্গে উঠে যায়ঃ বেশ করেছি তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি। একশবার দেবো। নির্দোষ লোকের নামে খুনের নালিশ করেছো, তোমার নরক হবে না!······হ্যাঁ হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার ভাব আছে তো আছে······তোমার ভাব নেই কারো সঙ্গে? ঢলানী মাগীটার সঙ্গে তো লোককে দেখিয়েই শোয়াবসা করো!

গাড়িটা লক করতে করতে ছটকু মৃদু হেসে চাপা গলায় বলল—

অ্যানাদার লীনা।

দু'চারজন লোক তাদের লক্ষ্য করছিল। আশপাশের জানালা দিয়ে প্রচুর উঁকিঝুঁকিও টের পায় গগন।

ছটকুর তাড়াহুড়ো নেই। ধীরেসুস্থে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখে। পাইপ ধরায়। তারপর বলে—চল।

—কোথায়?

—নরেশের ঘরে। বেগমকে একটু ক্রস করা দরকার।

—বেগম? সে এখানে থাকে না। গগন বলে।

—এখন আছে, চল।

গগনের বুক অসম্ভব কেঁপে ওঠে। পিছোনোর উপায় নেই। তবু বলল—তুই যা, আমি অপেক্ষা করি।

ছটকু ভ্রূ কুঁচকে বলে—তাতে লাভ হবে না। বেগমের সামনে তোর প্রেজেন্স্ খুব দরকার। নইলে ও শকড হবে না। বেগমের লেখা সেই চিরকুটটা কি হারিয়ে ফেলেছিস?

গগন মনে করতে পারল না। বলল—কোথায় রেখেছি কে জানে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছটকু বলল—এমন কিছু এসেনশিয়াল নয়। তুই পিছনে আয়, আমি আগে উঠছি।

দোতলায় নরেশের বৈঠকখানার দরজা খোলাই রয়েছে। ভিতরের কোনো ঘর থেকে শোভার গলা আসছে: সবাইকে বলব ফলির আসল বাপ তুমি। ওই নষ্ট মেয়েটার সঙ্গে তোমার শোয়া বসা।

ছটকু খুব হাসছে শুনে।

দুবার কলিংবেল বাজানো সত্ত্বেও কেউ এল না। তিনবারের বার ঝি এসে খোটকা মুখ করে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল—কী চাইছো?

ছটকু রোদ-চশমাটা এতক্ষণ খোলেনি। এবার খুলল। মুখটা

ভয়ঙ্কর গম্ভীর। চোখে ভীষণ ভ্রূকুটি। ছটকুর চোখ খুবই মারাত্মক। যখন রেগে যায় তখন তার দিকে তাকাতে হলে শক্ত কলজে চাই।

ঠাণ্ডা গলাতেই ছটকু নির্দ্বিধায় বলল—তোমার বাপকে চাইছি।

ঝি'টা কেমনধারা হয়ে গেল। চোখেমুখে স্পষ্টই ভয়। কথা বলল না, কিন্তু শুকনো মুখে চেয়ে রইল।

ছটকু প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বলল—যাও গিয়ে নরেশবাবুকে ডেকে দাও।

ঝি চলে গেল। ছটকু নিঃসঙ্কোচে বৈঠকখানায় ঢুকে একটা কৌচে গা এলিয়ে বসে গগনকে ডাকল—আয় গগ।

গগন খুব সংকোচের সঙ্গে ঢুকল, যেন বাঘের ডেরায় ঢুকছে। গরমে এমনিতেই তার ঘাম হচ্ছিল। এখন হঠাৎ তার সারাগায়ে ফোয়ারার মতো ঘামের স্রোত নামছে। পোশাক ভিজে যাচ্ছে, চোখে জিভে নোনতা জল ঢুকছে।

অনেকক্ষণ বাদে নরেশ এল। ভিতরে শোভার চেঁচামেচি একটু থেমেছে। গলার স্বর শোনা যাচ্ছে এখনো, তবে বকবকানির।

নরেশের পরনের লুঙ্গিটা উঁচু করে কোমরে গোঁজা। হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খালি গা, চোখ লাল, চুল উসকোখুসকো—যেন এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরেছে।

ঘরে ঢুকেই নরেশ আচমকা যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে লাফিয়ে উঠল। বিস্ময়ে বোবা। চোখ পটপটাং করে খুলে অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে।

ছটকু উঠে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বিনা ভূমিকায় নরেশের বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটা লোহার হাতে চেপে ধরে বলল—আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। বসুন।

ছটকুর কণ্ঠস্বরে কিছু ভদ্রতা থাকলেও আচরণে নেই। সে নরেশকে ধীরে টেনে এনে একটা সোফায় বসিয়ে দিল

নরেশ ঝেঁঝে উঠে বলল—হাত ধরছেন কেন ?

ছটকু হেসে বলে—লাগল বুঝি ?

নরেশ সে কথার জবাব না দিয়ে ছটকুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—এসব কী ব্যাপার ?

প্রশ্নটা গগনকে করা। নরেশ ছটকুকে চেনে না।

গগন জবাব দেয় না।

ছটকু কৌচে এলিয়ে বসে পাইপ টানতে টানতে বলে—নরেশবাবু, গগনকে অ্যারেস্ট করতে আপনি পুলিস ডেকেছিলেন ?

নরেশ হঠাৎ বিকট গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—একশবার ডাকব, শালার গুণ্ডার দল! ভেবেছো কি তোমরা ? বাড়িতে ঢুকে গায়ের জোর দেখানো হচ্ছে ? অ্যাঁ ?

বলতে বলতে আচমকাই নরেশ বে-হেড হয়ে লাফিয়ে উঠে একটা জয়পুরী ফুলদানী তুলে তেড়ে এল গগনের দিকে: গুণ্ডামীর আর জায়গা পাওনি ?

ছটকু হাত বাড়িয়ে নরেশের হাত টেনে ধরল এবং নিছক একটি ঝাঁকুনিতে তাকে নিস্তেজ করে আবার সোফায় বসিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল—মেইনলি আমরা বেগমের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, আপনার সঙ্গে নয়। তবে আপনাকেও দু'একটা জরুরী কথা বলা দরকার। সেটা পরেও হতে পারবে। এখন বেগমকে ডেকে দিন।

নরেশ যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। ভয়ংকর রাগী চোখে সে ছটকুকে দেখল, তারপর বলল—বেগমের সঙ্গে দেখা হবে না, আপনারা বেরিয়ে যান।

ছটকু পায়ে ওপর পা তুলে বসে বলে—বেআদবির সময় এটা নয়। গগন আমার বন্ধু। তাকে আপনি না-হক হ্যারাস করেছেন, পেছনে পুলিস লাগিয়েছেন। আমি আপনার সঙ্গে রসের কথা বলতে আসিনি। বেশী ত্যাঁদড়ামি করলে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে যাবো মেরে।

ছটকুর এই গলার স্বর গগনও চেনে না। খুবই ঠাণ্ডা গলা, কিন্তু তাতে ইস্পাতের মিশেল। যে শোনে সে জানে ছটকু প্রত্যেকটা কথাই মেপে বলছে। একটুও ভয় দেখাচ্ছে না। কিন্তু যা বলছে তাই করবে।

নরেশ এবার চোখ নামিয়ে বলল—বেগম ঘুমোচ্ছে।

ছটকু কিছু অধৈর্যের সঙ্গে বলল—তাকে তুলে দিন।

—সে অসুস্থ। তার ছেলে মারা গেছে।

—সেটা আমরা জানি। তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

ভিতরের দরজার পর্দা সরিয়ে হঠাৎ শোভা ভিতরে আসে। তার চেহারাটা বড় কিম্ভূত দেখাচ্ছে। চুলগুলো পাগলীর মতো উড়োখুড়ো, মুখ ফুলে রাবণের মা, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

গগনের দিকে চেয়ে বলল—আবার এসেছেন? ভাল চান তো পালান। নইলে ওই বদমাশ আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। জানেন না তো, ওর এখন পুত্রশোক

নরেশ উঠে শোভার দিকে তেড়ে যায়। গগন আটকানোর জন্য উঠতে যাচ্ছিল। ছটকু হাত বাড়িয়ে ইশারা করায় থেমে গেল।

নরেশ তেড়ে গিয়ে শোভাকে মারল না বটে, কিন্তু ঝাপটে ধরে হিচড়ে ভিতরে নিয়ে গেল। দরজাটা সপাটে বন্ধ হয়ে ছিটকিনি পড়ল ভিতর থেকে।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে—ছটকু, চল।

ছটকু না নড়ে বলে—দাঁড়া।

খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অল্প বাদেই অন্য একটা দরজার পর্দার আড়ালে একটা ফোঁফানির শব্দ উঠল, হিক্কা তোলার আওয়াজ। তীব্র হতাশার গলায় কোনো মহিলা বলে উঠলেন—সব গেল রে··· !

ঠিক তার পরেই পর্দা সরিয়ে খানিকটা টলমলে পায়ে বেগম ঘরে ঢোকে। খুবই করুণ তার চেহারা। সুন্দরী বেগমকে কে যেন

চোখের জল আর শোকের শুষ্কতা দিয়ে চটকে মেখেছে। সব রূপটুক ধুয়ে তার চেহারায় বয়সের ভাঁটা ফুটে উঠেছে এখন।

বেগম তার তুখানা বিভ্রান্ত চোখে গগনকে চেয়ে দেখল। যেন অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল—আমার ফলি কোথায় গেল ?

ছটকু খুব নরম গলায় বলে—আপনি বস্থন।

গভীর দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে যাওয়া গলায় বেগম বলে ওঠে—হা ভগবান !

তারপর নিজের অজান্তেই বুঝি সোফায় বসে পড়ে বেগম। চোখ বুজে থাকে। চোখের পাতা ভিজিয়ে জলের ধারা নেমে আসে অঝোরে। দাঁতে দাঁত চেপে থাকে বেগম, শুধু থরথর করে তার রক্তহীন সাদা ঠোঁট কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ছটকু বলে—ফলির মৃত্যুতে গগনের কোনো হাত ছিল না, বিশ্বাস করুন।

বেগম তার রক্তবর্ণ চোখে চাইল। প্রথমে কিছু বলল না। সামলাতে সময় নিল।

কিন্তু সামলে নিলও সে। আঁচলে চোখ মুছল। অনেকক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থেকে বলল—সেদিন······কবে যেন ?

গগন বলল—পরশু।

বেগম গগনের দিকে স্থিরচোখে চায়। তারপর একটু শিউরে উঠে বলে—সেদিন ফলি সন্ধ্যের পর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছিল। বলল, গগনদা আমাকে মেরেছে। আপনি কি ওকে সত্যিই মেরেছিলেন ?

গগন চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে—হ্যাঁ। নইলে ও আমাকে মারত। ওর হাতে পিস্তল ছিল।

বেগম ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলে—জানি। ওর কাছে পিস্তল থাকত। ইদানীং ও খুব বিপদের জীবন কাটাতো। আমি ওকে মানুষ করতে পারিনি, সে পাপের শাস্তি পেলাম গগনবাবু।

ছটকু নরম স্বরে বলে—কিন্তু ফলির মৃত্যুর পেছনকার ঘটনাটা আমাদের দরকার।

বেগম মাথা নাড়ে, বুঝেছে।

মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলে—ফলি গগনবাবুকে মারবার জন্য প্ল্যান করেছিল। মারা মানে খুন নয়। উল্টে ও নিজেই মার খায়। সন্ধ্যেবেলা যখন আমার কাছে এল তখন ভীষণ ফুঁসছে, ওরকম রেগে যেতে ওকে আর কখনো দেখিনি।

ছটকু হঠাৎ বলে ওঠে—আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেনি সেদিন ?

বেগম মুখটা নামিয়ে রেখেই বলল—হ্যাঁ। শুধু ঝগড়া নয়, আমাকেও ও মারে।

গগন অবাক হয়ে বলে—মেরেছে ?

—আমার ওপর ওর ভয়ঙ্কর রাগ ছিল। যতটা ভালবাসত ততটাই ঘেন্না করত আমাকে। আমার সম্পর্কে ওর কানে কে যেন কিছু খারাপ গালগল্প বলে বিষ ঢেলেছে, সেইদিন ও আমার জবাবদিহি চায়, আমি ওকে যত শান্ত করতে চাই, ও তত রেগে ওঠে। অবশেষে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দেয়, চড়-চাপড় মারে, গালাগাল করতে থাকে। হয়তো আরো মারত, পাড়ার লোক এসে ঠেকায়। তখন ও কার ওপর যেন শোধ নেবে বলে শাসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি তখন এত দিশেহারা যে ওকে আটকাতে পারিনি। পারলে—

ছটকু জিজ্ঞেস করে—ঝগড়া ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কোনো কথাবার্তা হয়নি ?

—না। সেদিন গগনবাবুর কাছে মার খেয়ে ফলি রাগে বেহেড হয়ে যায়। কেবল গগনবাবুর নামই করছিল। সেই থেকেই আমার সন্দেহ হতে থাকে—

ছটকু মাথা নেড়ে বলে—ভুল সন্দেহ বেগম দেবী।

বেগম ছটকুর দিকে স্থির-চোখে চেয়ে থাকে। দৃষ্টি স্বাভাবিক

নয়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে—তাহলে ফলিকে কে মেরেছে ?

—সেটা অনুমানের ব্যাপার। ছটকু গম্ভীর মুখে বলে। তারপর পাইপ ধরায়।

—অনুমানটা কী ?

—তার আগে বলুন এ পাড়ায় ফলি আর কার কার কাছে যেত—

—আমি তা জানি না। আমার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হত না। তবে শুনেছি আমার জামাইবাবুর কাছ থেকে সে মাঝে সাঝে ধার বলে টাকা নিত। কিন্তু বাড়িতে আসত না। গদীতে গিয়ে দেখা করত।

—আর কেউ ?

বেগম ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। তারপর বলে—না, আর কারো নাম সে কখনো বলেনি।

আচম্‌কা ছটকু প্রশ্ন করে—আপনার স্বামী কোথায় ? তিনি আসেননি ?

বেগম অবাক হয়ে বলে—স্বামী ? তিনি তো কাজে······মানে বাইরে গেছেন।

—তিনি ফলির মৃত্যু-সংবাদ জানেন ?

—শুনেছেন।

—বাইরে কোথায় গেছেন ?

—বলে যাননি।

—তার কলেজের ঠিকানাটা দিতে পারেন ?

বেগম একটু গম্ভীর মুখে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে—তাঁকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল। ওঁর শরীর খারাপ, তার ওপর এই ঘটনা।

ছটকু উঠে পড়ে। বলে—আপনার এই শোকে কিছু বলার নেই। শুধু অনুরোধ, গগনকে খামোখা ঝামেলায় জড়াবেন না।

গগন ফলিকে মেরেছিল বটে, কিন্তু সে আত্মরক্ষার জন্য। ও খুনে নয়।

বেগন একবার গগনের দিকে তাকাল। কবে সেই ভালবাসা মরে গেছে। এখন আছে শুধু কিছু সন্দেহ আর আক্রোশ।

তবু গগন বেগমের চোখে চোখ রেখে কিছু খুঁজল কি ?

॥ বারো ॥

মধ্য কলকাতার বিশাল কলেজবাড়ির ভিতরে ফলির বাবা মহেন্দ্রবাবুকে খুঁজে বের করতে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ আর খোঁজখবর করতে হল।

অবশেষে ল্যাবরেটরি থেকে বেয়ারা প্রায় ধরে আনল অ্যাপ্রন পরা বুড়ো মানুষটিকে।

বাঁ চোখের চশমার কাচ ফাটা, মুখে কদিনের বিজবিজে সাদা কাঁচা দাড়ি, মোটা গোঁফ ঠোঁট ঢেকে রেখেছে। ক্ষয়া ছোট চেহারা। চোখে সন্দেহের বা কৌতূহলের দৃষ্টি নেই। একটু ভীতু ভাব। পুত্রশোক অবশ্যই তাঁকে স্পর্শ করেনি। নিজেই প্রশ্ন করলেন—আপনারা আমাকে কেন খুঁজছেন ?

—এঁকে চেনেন ? বলে ছটকু গগনকে দেখিয়ে দেয়।

মহেন্দ্র গগনকে খুব ঠাহর করে দেখে বলেন—দেখেছি। ফলিকে ব্যায়াম শেখাতো।

—ফলি মারা গেছে, জানেন ?

—জানি। মহেন্দ্রর চোখেমুখে অস্বস্তি।

—আমরা ফলির বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

—জানার কিছু নেই। অতি বখাটে ছেলে ছিল। মরেছে, তা সে নিজেরই দোষে।

—শেষ কবে আপনার ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

মহেন্দ্র ভেবে-টেবে বলেন—কবে যেন! পরশুই হবে।

—কোনো কথা হয়নি?

—যতদূর মনে পড়ে, ও খুব রেগেমেগে বাড়িতে এসেছিল। কোনোদিনই আমার সঙ্গে বনে না। ওর সঙ্গেও না, ওর মায়ের সঙ্গেও না। আমরা একটা অদ্ভুত পরিবার।

—কোনো কথা হয়নি?

—তেমন কিছু নয়। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ফলি আমার ছেলে কিনা তাও আমি জানি না। ওর মায়ের চরিত্র ভাল নয়।

করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। আশেপাশে বহু ছেলে-ছোকরার যাতায়াত। কেউ হয়তো কথাটা শুনে ফেলতে পারে ভেবে গগন বরং সিঁটিয়ে গেল। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু বেশ স্বাভাবিক গলাতেই বলেন—তাই ও ছেলের জন্য আমার তেমন দুঃখ নেই।

ছটকু হতাশ হয় না। আস্তে করে বলে—কিন্তু আমার এই বন্ধুকে ফলির মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে। এ নির্দোষ।

মহেন্দ্র ফাটা কাচের চশমা দিয়ে গগনের দিকে তাকিয়ে বললেন—খুব নির্দোষ কি?

ছটকু দৃঢ়স্বরে বলল—অন্তত খুনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই।

—তা হবে। সে-সব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। মহেন্দ্র বললেন।

সংসারে বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতা আর মূল্যহীনতায় ভুগে ভুগে মহেন্দ্র এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছেন যে, আর কোনো ঘটনাকেই তেমন আমল দেন না। তাঁর মন এখন শক্ত হয়ে গেছে। দুনিয়ায় আর কারো কাছ থেকেই কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই।

ছটকু বলল—আমরা আপনার সাহায্য চাই, করবেন?

মহেন্দ্র একটু হাসলেন। সামনের চার-পাঁচটা দাঁত নেই। হাসিটা ভৌতিক এবং শ্লেষে ভরা। বললেন—আমার কিছু করার

নেই। ফলির মা শাস্তি পাচ্ছে, একমাত্র সেটাই সান্ত্বনা। প্রায়শ্চিত্ত যে এখনো করতে হয়, চন্দ্র-সূর্য যে বৃথা ওঠে না, সেটা জেনে বড় ভাল লাগছে।

ছটকু মহেন্দ্রবাবুর কাঁধ হাত বাড়িয়ে ধরে খুব নরম স্বরে বলে—আপনার স্ত্রী সম্পর্কে সবই আমরা জানি। দরকার হলে আমার এই বন্ধু সাক্ষ্য দেবে যে, আপনার স্ত্রীর চরিত্র ভাল নয়।

মানুষের দুর্বলতা কোথায় কোন্ সুপ্ত মনের কোণে থাকে কে জানে! কিন্তু ছটকু ঠিক জায়গায় খোঁচাটা মেরেছে। মহেন্দ্রর চোখ হঠাৎ উৎসাহে চিকমিকিয়ে ওঠে। দু পা হেঁটে মহেন্দ্র বলে—এখানে নয়। চলুন, একটা ঘর আছে।

ল্যাবরেটরির পাশেই একটা ছোট বসবার ঘর। ফাঁকা। সেখানে অনেক কটা কাঠের চেয়ার পড়ে আছে। তাতে ধুলোর আস্তরণ।

মহেন্দ্র গোটাতিনেক চেয়ার একটা ঝাড়নে পরিষ্কার করলেন। সবাই বসলে মহেন্দ্র বললেন—বেগমকে আমি জানি। তাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করি। তবে আমি শরীরের দিক থেকে খুব পটু ছিলাম না। বেগম বদমাইসী শুরু করল বিয়ের দু-তিন বছরের মধ্যে। সবই টের পেতাম, তবে তাকে রেড-হ্যাণ্ডেড ধরতে পারিনি কখনো।

—চেষ্টা করেছিলেন? ছটকু স্বাভাবিক কৌতূহল দেখায় যেন।

—না। ভয় করত। মনে হত, রেড-হ্যাণ্ডেড ধরলে মুখোমুখি ওর লাভারের সঙ্গে লড়াই লেগে যেতে পারে। তাছাড়া চক্ষুলজ্জা।

—অথচ ধরতে চান?

—খুব চাই। কিন্তু ধরলেই বা কী করব? থানা-পুলিস আদালতে যেতে পারব না। তাহলে লোকলজ্জা। নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারব না। কারণ শক্তি নেই। এমন কি দুটো কথা যে শোনাবো, তাও বেগমের সঙ্গে গলার জোরে পেরে উঠব না।

তাই ধরতে চাইলেও সেটা চাওয়াই থেকে যাবে।

—এতকাল ধরে ব্যাপারটা সহ্য করলেন কী করে ?

—মানুষ সব পারে, পারতে হয়।

—স্ত্রীকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চান না ?

মহেন্দ্র হেসে বললেন—শাস্তি ভগবান দিচ্ছেন।

—ভগবানের দেওয়া শাস্তিতে কি মানুষের মন ভরে ?

—আমার মতো দুর্বলের সেইটেই একমাত্র ভরসা।

ছটকু হেসে ফেলে। তারপর পাইপ ধরিয়ে বলে—মহেন্দ্রবাবু, আমি নিজে ভাল বক্সার। গায়ের জোরে এখনো যে কোনো পালোয়ানের সঙ্গে পাল্লা টানতে পারি। কিন্তু নিজের বউয়ের সঙ্গে আমি আজও এঁটে উঠতে পারিনি। আমি আপনার মতোই দুর্বল। কিন্তু সেটা মনের দুর্বলতা, শরীরের নয়। কাজেই আপনি শরীরের দিক দিয়ে দুর্বল বলেই নিজেকে দুর্বল ভাববেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে গায়ের জোরের অভাবে প্রকৃত সাহসীদের কেউ দুর্বল ভাবেনি।

মহেন্দ্র যেন বহুকাল পর এক ভরসার কথা পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললেন—কথাটা খুব ঠিক। আমার মনের জোর কম নেই। কিন্তু বেগমের মতো মেয়েছেলের সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানেই ফালতু ঝামেলায় জড়ানো। নিজেকে ছোট করতে ইচ্ছে হয়নি।

—কিন্তু বরাবর নিজেকে ছোট ভেবেছেন !

মহেন্দ্র প্রসন্ন হেসেই বললেন—কী করা ঠিক হত বলুন তো !

—চাবকানো। পাইপে টান দিয়ে ধীরস্বরে ছটকু বলে।

—ওটা পারতাম না।

—এবার পারবেন।

মহেন্দ্র গগনের দিকে চেয়ে বললেন—আপনি কী সাক্ষী দেবেন ?

গগনের কান-মুখ গরম হয়ে ওঠে। সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছটকুর সব বেহায়া কাণ্ড !

ছটকুই বলে—আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এই গগনের ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল।

গগন ভেবেছিল মহেন্দ্র এ কথা শুনে ফেটে পড়বে।

কিন্তু তার বদলে মহেন্দ্র চেয়ার আর একটু কাছে টেনে এনে বিগলিতভাবে বললেন—তাহলে এই প্রথম আমি একটা প্রমাণ পাচ্ছি। একটু বলুন তো এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা!

গগন লজ্জা ভুলে ভীষণ অবাক হয়।

ছটকু সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে বলে—ও কী বলবে? ওর তো দায়িত্ব ছিল না। চেহারাটা ভাল বলে আপনার স্ত্রীই ওকে পিক আপ করে।

মহেন্দ্র গগনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে—হ্যাঁ, চেহারাটা ভাল। আপনারা দুজনেই ব্যায়াম করেন, না?

—করি। ছটকু জবাব দেয়।

—আমারও খুব শখ ছিল। হয়নি। অল্প বয়সেই সংসারে ঢুকে গেলাম। আমার স্ত্রী কী রকম করত আপনার সঙ্গে? গগনকে জিজ্ঞেস করেন মহেন্দ্র।

ছটকু গগনকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে—বল না।

গগন টের পায়, মহেন্দ্র খুবই কুৎসিত মনোরোগে ভুগছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেহ-সম্বন্ধ নেই, ঘৃণা আর রাগের সম্পর্ক। কিন্তু স্ত্রীর কাছে তাঁর অবদমিত শারীরিক ক্ষুধা মেটেনি বলেই তা আজ বিকৃত ভাবে তৃপ্তি খুঁজছে, স্ত্রীর প্রেমিকের কাছ থেকে তিনি সেই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির বিবরণ চান।

ছটকু আবার ঠেলা দিয়ে চোখের ইশারা করে বলে—বল না।

মহেন্দ্রও বলে ওঠেন—ও কি খুবই কামুক? বাঘিনীর মতো?

গগন অস্পষ্ট স্বরে বলে—হ্যাঁ।

—কামড়ে দিত আপনাকে? মারত?

—হ্যাঁ।

ছটকু বাধা দিয়ে বলে—আর সব পরে শুনবেন মহেন্দ্রবাবু, আগে কাজের কথাটা হয়ে যাক। সেদিন ফলির সঙ্গে আপনার কী কথা হয়?

মহেন্দ্রকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তবে সে উত্তেজনা আনন্দের। চোখ চকচক করছে, মুখটা উজ্জ্বল, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। উঠে গিয়ে ঘরের পাখাটা চালু করলেন। চারদিকে ধুলো উড়তে লাগল বাতাসে।

মহেন্দ্র মুখোমুখি বসে বললেন—ফলি কোনোদিনই আমাকে পাত্তা দিত না। বুঝতেই পারছেন, মা যদি সম্মান না করে তবে ছেলে-মেয়েরাও কোনোদিন বাবাকে সম্মান করতে শেখে না। বেগম কোনোদিন আমাকে মানুষ বলেই মনে করেনি কিনা! তবে ফলি যখন খুব ছোট ছিল, তখন কিন্তু আমাকে ভীষণ ভালবাসত।

—আপনি কি বরাবরই জানতেন যে, ফলি আপনার ছেলে নয়?

মহেন্দ্র ফাটা কাচের ভিতর দিয়ে ভৌতিক দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন—ঐ একটা বিষয়ে আমি আজও ডেফিনিট নই। ফলি যখন জন্মায় তখনো ওর মার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। কাজেই কী করে বলি ও আমারই ছেলে নয়? তবে ওর চেহারা স্বভাব কিছুই আমার মতো ছিল না।

—তারপর?

—বিয়ের চার পাঁচ-বছর পর ফলি জন্মায়। তখন বেগম খুব বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে। আমি তখন ঝিমিয়ে গেছি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তখন খুব খারাপ। ফলি সে সময়ে জন্মায়। তার আগে অবশ্য আমি গোপনে ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, সন্তানের বাপ হওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। তাই ফলি জন্মানোর পর আমি তাকে নিজের ছেলে মনে করে খুব ভালবাসতাম। পরে ও বড় হলে বেগম ওর মন বিষাক্ত করে দেয়। কিন্তু তার ফলে বেগমেরও কিছু লাভ হয়নি। ফলি

ওকেও দেখতে পারত না। এক ছাদের তলায় আমরা তিন শত্রু বসবাস করতাম।

—ফলির সঙ্গে আপনার ঝগড়া হত ?

—না, কারো সঙ্গেই আমার মুখোমুখি ঝগড়া ছিল না। তবে মানুষ মানুষকে অপছন্দ করলে সেটা মুখে বলার দরবার হয় না, এমনিতেই বোঝা যায়।

—তা ঠিক।

—তবে ফলির সঙ্গে আমার কখনো-সখনো কথা হত। ওর গর্ভধারিণীর সঙ্গে হতই না।

—সেদিন কী কথা হল ?

—আমি সন্ধ্যের বেশ কিছু পরে বাড়ি ফিরে দেখি, বাড়িতে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, চেঁচামেচি চলছে। পাড়া-প্রতিবেশীর কাছেই শুনলাম ফলি তার মাকে খুব মেরেছে। শুনে ভারী আনন্দ হল। এর আগেও ফলি কয়েকবার ওর মাকে মারধর করেছে। বড় হয়ে মায়ের গুণের কথা শুনেছে তো! ছেলে হয়ে মায়ের বদমাইসী সহ্য করে কী করে ? সে যাই হোক, গোলমাল দেখে আমি আর বাড়ির মধ্যে না ঢুকে বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছু বাদে দেখি ফলি খুব জোরে হেঁটে আসছে। ওর মুখ-চোখ খুনীর মতো। কী যেন হল আমার, ওকে ডাকলাম। ও থমকে দাঁড়াল। প্রথমে ভাবলাম, বুঝি আমাকেও মারে। কিন্তু ওসব করল না। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, নিজের বউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারো না ? আমি তার জবাব দিলাম না। মনে মনে জানি, আমাকে মারতে হবে না। মা-ব্যাটায় নিজেরাই খেয়োখেয়ি করে মরবে একদিন। যাকগে, ফলি আমাকে বলল, সিংহীদের বাগানে আমার সঙ্গে রাত আটটা নাগাদ দেখা কোরো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ। তবে রাত আটটার অনেক আগে।

বলে মহেন্দ্র ফাটা কাচের ভিতর দিয়ে নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টি এমনিতে যতই নির্বিকার মনে হোক, ছটকু টের পেল মহেন্দ্র কিছু একটা বলতে চান। তাই সে নরম স্বরে বলল—কী দেখলেন সেখানে?

—ফলির সঙ্গে দেখা হয়নি। একটু আগে আগে পৌঁছে ভাবলাম, জায়গাটা ঘুরে দেখি। বুড়ো সিংহীর অনেক টাকা ছিল। কৃপণ লোক ছিলেন। আমার ধারণা, সিংহীবাড়ির কোনো গুপ্ত জায়গায় বিস্তর লুকোনো টাকাকড়ি বা সোনাদানা আছে। আমার আবার ছেলেবেলা থেকেই গুপ্তধনের শখ। একটা টর্চ ছিল। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ঘরের দরজায় তালা ছিল। তবে একটা জানালার পাল্লা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি সেই পাল্লা খুলে দেখি, লোহার গরাদের একটা শিক ভাঙা। ঢোকা যায় দেখে ঢুকেই পড়লাম। ঘরে ঢুকে দেখি, ধুলোটুলো কিছু নেই। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরদোর। এদিক ওদিক ঘুরে একটা ভিতরদিকের ঘরে গিয়ে দেখি, খাটিয়ায় বিছানা পাতা রয়েছে। শতরঞ্চী, মোমবাতি, তাস, সিগারেটের অনেক প্যাকেট আর খালি মদের বোতল। দেখে ভয় খেয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই গুণ্ডা-বদমাসের আস্তানা। ভয় খেয়েও অবশ্য পালাইনি, ভাল করে চারধারের সব কিছু দেখে নিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ বাইরে কোথায় চাপা গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ভয়ে দোতলার সিঁড়ির তলায় গা-ঢাকা দিই। বেশীক্ষণ নয়, একটু বাদেই ফলি আর কয়েকজন লোকের গলা পেলাম। খুব ঝগড়ার গলায় কথা হচ্ছিল। ফলি চিরকালের ডাকাবুকো। শুনলাম সে বলছে—গগনকে আজই খতম করব। তারপর তোদেরও ব্যবস্থা হবে। আমি তাদের কাউকেই দেখতে পাইনি। শুধু গলা শুনেছি।

—কোনো স্বর চেনা মনে হয়নি?

—না। ফলির গলা ছাড়া আর কারো গলা চিনতে পারিনি।

তবে একজনের গলা খুব মোটা। যেন মাইক লাগিয়ে কথা বলছে। সে ফলিকে বলল—গগন তোর মার সঙ্গে লটঘট করেছে, তাতে আমাদের কি? আমরা খুনখারাবির মধ্যে নেই। একজন বুড়ো মানুষের গলাও পেয়েছিলাম বলে মনে হয়। তবে সে যে কী বলেছিল তা ধরতে পারিনি।

—আর কিছু?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন—না, কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা বেরিয়ে গেল। তারপর আমি আর সেখানে থাকবার সাহস পাইনি।

—ফলি আপনাকে কী বলতে চেয়েছিল তা আন্দাজ করতে পারেন? নিভন্ত পাইপে আবার আগুন দিয়ে ছটকু বলে।

—না। আপনাদের সঙ্গে পরে আবার কথা হতে পারে। এখন আমার কাজ আছে। বলে মহেন্দ্র উঠে পড়লেন।

ছটকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—ফলির জন্য আপনার কোনো শোক নেই?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন—থাকার কথাও নয়। একে সে আমার ছেলে কিনা তাই সন্দেহের বিষয়। তাছাড়া অতি বদমাস ছেলে।

॥ তেরো ॥

কী হয়েছিল তা কেউ বলতে পারবে না।

সন্তুর হাতে-মুখে রক্ত চটচট করছে। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। গোঙাতে গোঙাতে সে কয়েকবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওদিকে কালু নট নড়ন-চড়ন হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর।

সিংহীদের নির্জন বাগান। এখান থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও

কেউ শুনতে পায় না। সন্তু যখন শেষবার জ্ঞান ফিরে পেল তখন তার শরীর এত দুর্বল যে, বাগানটা হেঁটে পার হয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভাবাই যায় না। চোখে সে সব কিছু সাদা দেখছে। বমি আসছে বুক গুলিয়ে। ওঠার ক্ষমতা নেই। হাঁফ ধরে যাচ্ছে শুধু শ্বাস টানার পরিশ্রমে।

হামাগুড়ি দিয়ে সে কোনোক্রমে বসে। তারপর বহুদিন বাদে তার চোখ দিয়ে হু-হু করে কান্নার জল নেমে আসে।

আর সেই কান্নার আবেগে আর একবার সে জ্ঞান হারায়।

জ্ঞান ফেরে আবার। তাকিয়ে দেখে সে একটা ঘরে শুয়ে আছে। তার মাথা-মুখ ভেজা।

চোখ খোলার পরই সে তার বাবাকে দেখতে পেল। দাড়িওলা সেই ভয়ংকর মুখ, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি। দয়ামায়া রস-কষহীন এক মানুষ এই নানক চৌধুরী।

ঠাণ্ডা গলায় বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কালুকে মেরেছো ?

এ কথার জবাব সন্তুর মাথায় আসে না। কিন্তু খুব আবছা হলেও তার মনে পড়ে, কালুকে মারবার সুযোগ সে পায়নি। ছুরি নিয়ে ধেয়ে যাওয়ার সময়ে কালুর ইঁটের ঘায়ে সে মুখথুবড়ে পড়ে যায়। তারপরও আবছা মনে পড়ে, কালু ছুটে এসে ইঁটটা তুলে তার মুখে মাথায় বার বার মেরেছে। তারপরও যদি সে কালুকে মেরে থাকে, তবে তা সজ্ঞানে নয়।

সন্তু বলল—মনে নেই।

নানক গম্ভীর হয়ে বলেন—কালুর পেটে আর বুকে ছুরির জখম। কাজটা ভাল করোনি।

এক ভয়ংকর আতঙ্কে সন্তু চোখ বুঝল। খানিক বাদে আবার চোখ খুলল। সে শুয়ে আছে সিংহীদের বাড়িতে। এই ঘরেই একদা তাকে নীলমাধব মেবেছিল। এ বাড়িতেই সে একদিন গুণ্ডা বেড়ালকে ফাঁসি দিতে এসে এক রহস্যময় অচেনা লোকের হাতে মার খায়।

সন্তু ডাকল—বাবা !

তার গলাটা কেঁপে যায়।

নানক সামান্য ঝুঁকে বলেন—কী ?

—এ বাড়িতে কে থাকে ?

—কে থাকবে ? নানক অবাক হয়ে বলেন—কেউ থাকে না।

সন্তু অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। তেষ্টায় গলা শুকনো। জিভে ঠোঁট চেটে নিয়ে সে বলে—কেউ থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। একবার কে যেন এখানে আমার মাথায় পিছন থেকে লাঠি মেরেছিল।

নানক ঘটনাটা জানেন। চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন—জানি না।

সন্তু তার বাবার দিকে তাকায়। বাবার পাঞ্জাবির হাতায় রক্ত লেগে আছে। দাড়ির ডগাতেও তাই। তাকে বাগান থেকে তুলে আনবার সময় বোধহয় লেগেছে। তবু সন্তু তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে নানা কথা উঁকি মারে।

সন্তু হঠাৎ বলল—আমি কালুকে মারিনি।

—তুমি ছাড়া কে ?

—তা জানি না। তবে আমি নই।

নানক চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন—সে কথা এখন ভাববার দরকার নেই। ঘুমোও।

—আমি বাড়ি যাবো।

—একটু পরে। এখন তোমাকে নিতে গেলে আরও ব্লিডিং হতে পারে।

সন্তু তার বাবার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে বলে—মার কাছে যাবো। আমাকে এখানে রেখেছেন কেন ?

নানক গম্ভীর হয়ে বললেন—আমি সময়মতো এসে না পড়লে এতক্ষণ তুমি বাগানেই পড়ে থাকতে।

সন্তু উঠবার চেষ্টা করে বলে—কালু কি এখনো বাগানেই পড়ে-

আছে ?

নানক ঠাণ্ডা গলায় বলেন—ও বোধ হয় বেঁচে নেই।

—কিন্তু আমি ওকে মারিনি। ও একটা মার্ডার কেস-এর ভাইটাল আই-উইটনেস।

এসব কথা সন্তু ডিটেকটিভ বই পড়ে শিখেছে। সে জানে কালু মরে গেলে ফলির খুনের কিনারা হবে না।

নানক তার বুকে হাতের চাপ দিয়ে ফের শুইয়ে দিলেন। একটু কড়া গলায় বললেন—তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শোনো, কালুর সঙ্গে যে তোমার আদৌ দেখা হয়েছে তা আর কাউকে বলতে যেও না।

—কেন ?

নানক বিরক্ত হয়ে বলেন—তোমার ভালর জন্যই বলছি। এইটুকু বয়সেই তুমি সব রকম অন্যায় করেছো। তুমি ইনকারিজিবল। কিন্তু তবু আমি চাই না, পুলিস তোমাকে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাক।

—কিন্তু কালুকে আমি মারিনি।

—সেটা আমি বিশ্বাস করি না, পুলিসও করবে না। কাজেই বেআদবি করে লাভ নেই। যা বলছি শোনো।

সন্তু আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবাক হয়ে সে তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

নানক বললেন—তুমি ছাড়া কেউ কালুকে মারেনি।

—আমি নই। সন্তু গোঁ ধরে বলে।

—তুমিই। আমি ভাবছি তোমাকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেবো। এখানে থাকা তোমার ঠিক হবে না।

সন্তু চুপ করে থাকে। কিন্তু তার মন নিশ্চুপ নয়। সেখানে অনেক কথার বুদ্বুদ উঠছে। সে খুব নতুন একরকম চোখে তার বাবার দিকে তাকায়। তারপর এত ব্যথা আর যন্ত্রণার মধ্যেও ক্ষীণ একটু হাসে।

গগন আর ছটকু যখন সিংহীদের বাড়িতে ঢুকল তখন বিকেল যাই-যাই। এর আগে তারা আর একটা মস্ত কাজ সেরে এসেছে। প্রায় মৃত্যুপথের যাত্রী কালুকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে।

কালুর জ্ঞান ফেরেনি। ফেরার সম্ভাবনাও খুব কম। অক্সিজেন চলছে। ঐ অবস্থাতেই ডাক্তাররা তার ওপর অপারেশন চালিয়েছে। জানা গেছে তার ফুসফুস ফুটো হয়েছে, পেটের দুটো নাড়ী কাটা। বাঁচা মরার সম্ভাবনা পঞ্চাশ পঞ্চাশ।

ছটকু পুলিসকে ঘটনাটা ফোনে জানিয়ে দিল। তারপর গগনকে নিয়ে বিকেলের দিকে সোজা আবার গাড়ি চালিয়ে সিংহীদের পোড়ো বাড়িতে।

ছটকু জানে। জেনে গেছে।

সদর দরজায় তালা ছিল, যেমন থাকে। ছটকু একটু চারদিক ঘুরে দেখল। পিছনের বাথরুমে মেথরের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

নিঃশব্দে ভিতরে ঢোকে ছটকু। সঙ্গে গগন।

ভিতরে অন্ধকার জমেছে। এখানে সেখানে কিছু পুরোনো আধ-ন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথুরে মূর্তি। শেষ রোদের কয়েকটা কাটা ছেঁড়া রশ্মি পড়েছে হেথায় হোথায়।

বেড়ালের পায়ে এগোয় ছটকু। এ ঘর থেকে সে ঘর।

অবশেষে ঘরটা খুঁজে পায় এবং চৌকাঠের বাইরে চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকে।

ভিতরে সন্তু ক্ষীণ একটু ব্যথার শব্দ করে বলে—আমি বাড়ি যাবো বাবা।

—যাবে। সময় হলেই যাবে।

ছটকু সামান্য গলাখাঁকারি দেয়।

অন্ধকার ঘরে নানকের ছায়ামূর্তি ভীষণ চমকে যায়।

ছটকু ঘরে ঢোকে। মাথা নেড়ে বলে—কাজটা ভাল হয়নি

নানকবাবু।

নানক অন্ধকারে চেয়ে থাকেন।

ছটকু গগনকে ডেকে বলে—তুই সন্তুকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে যা। ওকে এক্ষুনি ডাক্তার দেখানো দরকার।

গগন ঘরে ঢোকে। গরিলার মতো দুই হাতে সন্তুকে বুকে তুলে নেয়। নিজের ছাত্রদের প্রতি তার ভালবাসার সীমা নেই।

নানক কী একটু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

গগন সন্তুকে নিয়ে চলে গেলে ছটকু পাইপ ধরায়। তারপর নানকের দিকে চেয়ে বলে—আমি সবই জানি। কালু মরেনি।

নানক কথা বললেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ছটকু বলল—কিছু বলবেন ?

নানক খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন—আমার ছেলেটা মানুষ হল না।

—আমরা অনেকেই তা হইনি। কালুকে কে মারল নানকবাবু ?

—বদমাস এবং পাজিদের মারাই উচিত।

—কিন্তু সে কাজ আপনি নিজের হাতে করতে গেলেন কেন ?

নানক আস্তে করে বললেন—সন্তুর জন্য। ভেবেছিলাম সন্তুকে চির-কাল একটা খুনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখব। সেই ভয়ে ও ভাল হয়ে যাবে।

—নিজের ছেলের স্বার্থে আর একটা ছেলেকে মারতে হয় ?

—মাঝে মাঝে হয়।

ছটকু পাইপ টানল খানিকক্ষণ। তারপর বলল—কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল ?

—আমি। ভেবেছিলাম, কালুকে হাত করে গগনকে ফাঁসাবো। ওর ব্যায়ামাগারটা তুলে দেওয়া দরকার। সেখান থেকে গুণ্ডা বদমাসের সৃষ্টি হচ্ছে।

ছটকু হেসে বলে—আপনি সমাজের ভাল চান, ছেলের ভাল চান, কিন্তু আপনার পদ্ধতিটা কিছু অদ্ভুত।

—বোধ হয়। শান্তস্বরেই নানক বলেন।